পঞ্চ - মাণিক্য

৺কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক
গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা
ত্রিপুরা সরকার

৺কালী প্রসন্ন সেনগুপ্ত

পঞ্চ-মাণিক্য

৺কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত

সন ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক
গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা
ত্রিপুরা সরকার

৺কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বিদ্যাভূষণ প্রণীত ''পঞ্চ-মাণিক্য''।

প্রথম প্রকাশ ঃ সন ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ

প্রকাশক ঃ শ্রী মহেন্দ্র নাথ দাস
''রাজমালা'' কার্য্যালয়
আগরতলা, ত্রিপুরা।

পুণঃমুদ্রণে ঃ ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র ও
সংগ্রহ শালা। ত্রিপুরা সরকার।

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬।
১৪০৬ ত্রিপূরাব্দ।

মুদ্রণে ঃ মেগা কম্পিউটার,
বিদূরকর্তা চৌহমুনী, ৬নং ঠাকুর পল্লী রোড,
কৃষ্ণনগর, আগরতলা।

প্রচ্ছদ অলংকরণে ঃ মাইক্রোগ্রাফিক্স,
মন্ত্রীবাড়ী রোড, আগরতলা।

মূল্য ঃ

প্রকাশক কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস মহারাজা মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে, সি, এস, আই।

"পঞ্চ-মাণিক্য"

'রাজমালা' সম্পাদক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'বার্ষিক ত্রিপুরা' নামক একখানি বার্ষিক পত্রিকার জন্য এ রাজ্যের প্রাতঃস্মরনীয় পাঁচ জন নৃপতির জীবনী অবলম্বন করিয়া 'পঞ্চ-মানিক্য' নামে একটি নিবন্ধ সংকলন করেন। উহা প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের আদেশে উক্ত বিবরনী পৃথক করিয়া বর্ত্তমানে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। বিবরনীগুলি প্রয়োজনানুসারে সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে।

আগরতলা
৩০শে আশ্বিন, ১৩৫১ ত্রিং।

ভূমিকা

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র প্রতিনিয়ত উপজাতীয় জীবন সংস্কৃতি ও অতীত ইতিহাসের ঘটনাবলীর উপর তথ্যমূলক ও বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি প্রকাশনায় নিয়োজিত আছে। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বিদ্যাভূষণ রচিত "পঞ্চমাণিক্যে"র পুনঃপ্রকাশ এই প্রকাশনার একটি সংযোজন মাত্র।

এই গ্রন্থটিতে ত্রিপুরার পাঁচজন বিখ্যাত ও ঐতিহাসিকদের দ্বারা সমর্থিত ত্রিপুরাধিশ্বরের ঘটনা বহুলকাহিনীকে অবলম্বন করে জীবনী রচিত হয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের হাজারো উৎসুক পাঠক, কিশোর কিশোরী ও গবেষক প্রায়শই ত্রিপুরার ইতিহাস ও মহারাজাদের বিষয়ে নানা কথা জানতে চান। পাঠক মহলের চাহিদানুযায়ী উপযোগী গ্রন্থ হিসাবে এই পুস্তকটি প্রকাশে ব্রতী হয়েছি। সহজ ও সরল ভাবপ্রকাশভঙ্গীর প্রাঞ্জলতায় পুস্তকটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে আশাকরি।

পুস্তকটি পুণঃপ্রকাশে হস্তান্তর করে শ্রীযুক্ত ধ্ববলকৃষ্ণ দেববর্মা (উজীর বাড়ী) আমাদের উপকৃত করেছেন। তারজন্য উনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পুস্তকটি প্রকাশনায় শ্রী অরুন দেববর্মার (গবেষনা সহায়ক) আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও কৃষ্ণা সরকারের নিরলস শ্রমে সুন্দর ও পরিচ্ছন্নভাবে যথাসময়ে প্রকাশিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

৩১শে ডিসেম্বর,
আগরতলা।

কমিশনার
ত্রিপুরা সরকার

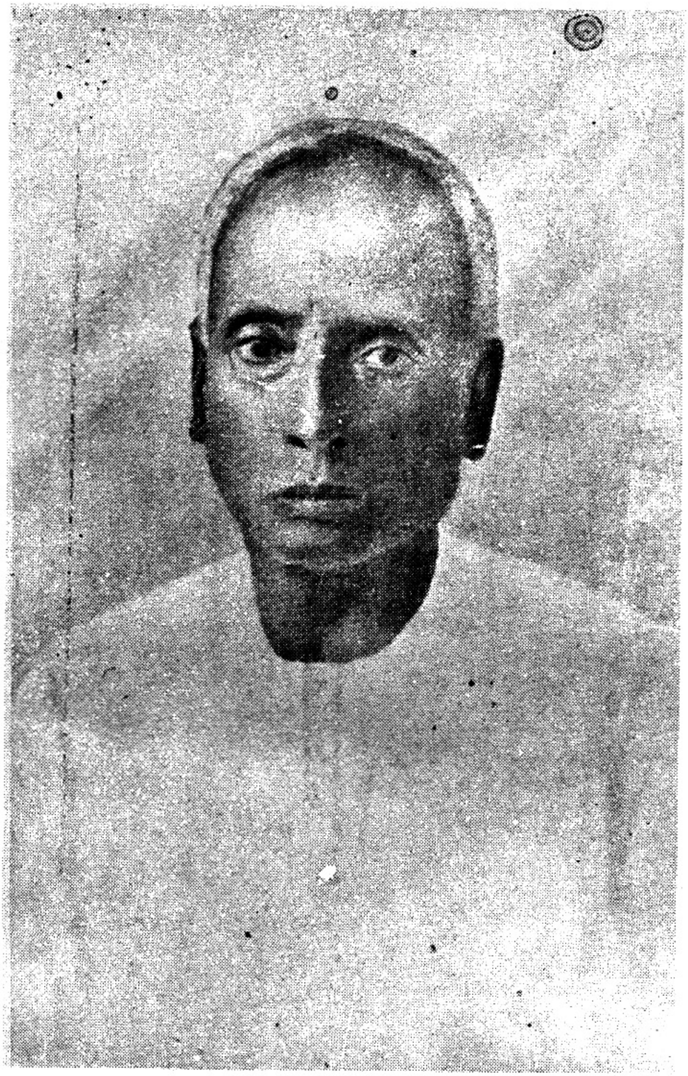

রাজমালা সম্পাদক—স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত বিদ্যাভূষণ

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য	৭
২।	মহারাজ ধন্যমাণিক্য	১২
৩।	মহারাজ বিজয়মাণিক্য	২৩
৪।	মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য	৩৪
৫।	মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য	৫৯

পঞ্চ-মাণিক্য

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য

ত্রিপুরাধীশ্বর মহামাণিক্যের পঞ্চ পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মদেব অল্প বয়সে সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়া সংসার ত্যাগী হইয়াছিলেন। তিনি বহু তীর্থ পর্যটনের পর, বারাণসী ধামে উপনীত হইয়া, মণিকর্ণিকা ঘাটের সন্নিহিত এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। একদা তিনি বৃক্ষচ্ছায়ায় মুক্ত বাতাসে নিদ্রিত আছেন, এই সময় একটী বিষধর সর্প তাঁহার মস্তকোপরি ফণা বিস্তার করিয়া, পত্র বিরল পথে পতিত আতপ তাপ নিবারণ করিতেছিল। কান্যকুব্জ দেশীয় কৌতুক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক কাশী বাস করিতেছিলেন, তিনি গঙ্গা স্নান ব্যপদেশে গমন কালে এ ঘটনা দর্শন করিয়া ব্যস্তভাবে সন্ন্যাসীকে জাগ্রত করিলেন। সর্পটি অপসৃত হইবার পর , ব্রাহ্মন সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, প্রত্যুত্তরে-

সন্ন্যাসীরে বলে আমি জাতিয়ে ত্রিপুর।
অগ্নি কোণে রাজ্য আমা হয় বহু দূর ॥

রাজমালা, -২য় লহর, ৩পৃষ্ঠা।

ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ, তিনি জানিতেন যাঁহার মস্তকে সর্পে ফণা ধারণ করে, তিনি নিশ্চয়ই রাজত্ব লাভ করিবেন।* তিনি সন্ন্যাসীকে বলিলেন- "আপনি অসাধারণ ব্যক্তি, এ অবস্থায় এখানে থাকিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছেন কেন ? দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, আপনার মস্তকে রাজমুকুট শোভা পাওয়া অনিবার্য্য।" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন-"দেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে আপনাকে আমার অনুগামী হইতে হইবে।" ব্রাহ্মণ এই প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মতি দান করিলেন।

এদিকে ত্রিপুরেশ্বর মহামাণিক্য স্বর্গীয় হওয়ায়, তাঁহার পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিরোধ আরম্ভ হইল, তাঁহাদিগকে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া, সৈন্যাধ্যক্ষগণেরও মতিভ্রম ঘটিল। সেকালে সেনাপতিগণের অত্যধিক প্রাধান্য ছিল,

* এই ধারণা হিন্দুশাস্ত্র সম্মত। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি এবম্বিধ আরোপের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

তাঁহারা সুযোগ পাইয়া, রাজপুত্রদিগকে অপসারণপুর্ব্বক সকলেই সিংহাসন অধিকারের নিমিত্ত উত্থিত হইলেন। এই ঘোর রাষ্ট্র বিপ্লবে রাজ্যময় অশান্তির বীজ ছড়াইয়া পড়িল, সকলেই ধন প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া অধীর হইয়া উঠিল।

অমাত্যবর্গ বুঝিলেন, জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র ধর্ম্মদেবকে রাজা করা ব্যতীত এই অশান্তি নিবারণের অন্য উপায় নাই। তখন তাঁহারা রাজকুমারের সন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। তাহাদের একদল নানাদেশ ভ্রমণের পর, বারাণসী ধামে উপস্থিত হইয়া, ধর্ম্মদেবের সন্ধান পাইল, এবং রাজ্যের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা গোচর করিয়া, তাঁহাকে রাজ্যে প্রর্ত্যাবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত অমাত্যবর্গের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইল।

কুমার বুঝিলেন, পৈতৃক সিংহাসন লুণ্ঠনের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে-প্রকৃতিপুঞ্জ বিপদাপন্ন-দেশ উৎসন্নের পথে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার কোমল হৃদয়ে এই সংবাদ দারুণ শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল। ধর্ম্মাচরণ গৃহে বসিয়াও চলিতে পারে, বিশেষতঃ রাজত্ব লাভ করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠানের নানাবিধ সুযোগ ঘটিবে। সুতরাং তিনি সন্ন্যাসব্রত উদ্‌যাপন অপেক্ষা দেশ ও রাজ্য রক্ষা করা অধিকতর কর্ত্তব্য মনে করিলেন; এবং সেই কর্ত্তব্য নিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় তিনি কৌতুকাদি আটজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়াছিলেন।

কুমার ধর্ম্মদেব রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন জানিয়া, ভ্রাতাগণ রাজ্য লালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তভাব ধারণ করিলেন, সেনাপতিগণও নিরস্ত হইলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া, কুমার ধর্ম্মদেবকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক রাজধানীতে লইয়া গেলেন। অতঃপর কুমার ধর্ম্মদেব ১৩৫৩ শকে (১৪৩১খ্রীঃ) ধর্ম্মমাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক পিতৃ সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। * প্রথম বয়সে ধর্ম্মার্জ্জনই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, রাজত্ব লাভ করিয়াও তিনি সেই ব্রত ভঙ্গ করেন নাই। রাজর্ষির ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে রাজ্য শাসন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে যুদ্ধ বিগ্রহাদি অশান্তিজনক ঘটনা বা অন্য কোনরূপ পীড়াদায়ক উপদ্রব উপস্থিত হয় নাই। এই সময় প্রকৃতিবর্গ ধার্ম্মিক এবং সুখ সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল।

---

* রাজমালা,-২য় লহর, ১৭৬ পৃষ্ঠা

ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান মহারাজ ধর্ম্মের জীবনের সার ব্রত ছিল। দেবালয় স্থাপন, জলাশয় প্রতিষ্ঠা এবং ভূমি দান ইত্যাদি বিস্তর ধর্ম্মমূলক কার্য্যে তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ১৩৮০ শকে সম্পাদিত একটি কার্য্যের স্থুল বিবরণ এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে। রাজমালায় লিখিত আছে, -

"তেরশত আশী শকে শ্রীধর্ম্ম মাণিক্য।
নৃপতির নীতি ধর্ম্ম বলিতে অশক্য॥"

রাজমালা, -২য় লহর, ৪পৃষ্ঠা।

এই ধর্ম্ম কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণও রাজমালায় পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে; -

"পরকাল চিন্তি রাজা চিত্ত শান্তাইল।
ভূমিদান করিবারে ব্রাহ্মণ আনিল॥
ধর্ম্মসাগর নামেতে জলাশয় দিয়া।
তার চারি পারে সব দ্বিজ বসাইয়া॥
মহাবিষুবেতে দিল ভূমি উৎসর্গিয়া।
কৌতুকাদি বাণেশ্বর ব্রাহ্মণ অর্চ্চিয়া॥
কৌতুকাদি ব্রাহ্মণেতে করে ভূমিদান।
তাম্র পত্রে লিখি দিল বচন প্রমাণ॥"

রাজমালা, - ২য় লহর, ৫পৃষ্ঠা।

উদ্ধৃত বাক্যে বা তাম্রশাসনে ভূমি গ্রহীতা সকল ব্রাহ্মণের নামে লিখিত হয় নাই। উক্ত বাক্যে কৌতুক ও বাণেশ্বরের নামমাত্র পাওয়া যাইতেছে। এই কৌতুক কর্ণৌজী ব্রাহ্মণ, মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য ইহাকে বারানসী হইতে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বাণেশ্বর শ্রী হট্টবাসী ইনি রাজ পুরোহিত ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। অনুজ শুক্রেশ্বরের সহযোগে ইনি ত্রিপুরার প্রচীন ইতিবৃত্ত রাজমালা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত ধর্ম্মসাগর এক বিশালবাপী। কুমিল্লা নগরীর বক্ষস্থিত এই সুবৃহৎ তড়াগ আজ পর্য্যন্তও স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যকর বারি দান দ্বারা মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের অতুলনীয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই সাগর প্রতিষ্ঠা কালে মহারাজ ধর্ম্ম, ধর্ম্মভাব প্রণোদিত

হইয়া, ব্রাহ্মণদিগকে তাম্রশাসন দ্বারা ভূমিদান করিবার বিষয় পূর্ব্বোদ্ধৃত রাজমালার বাক্যেই পাওয়া গিয়াছে। উক্ত তাম্র ফলকে যে সকল বাক্য উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

"চন্দ্রবংশোদ্ভব স্বাপ মহামাণিক্যজঃ সুধী।
শ্রীশ্রীমদ্ধর্ম্ম মাণিক্য ভূপশ্চন্দ্র কুলোদ্ভবঃ ॥
শাকে শূন্যাষ্ট বিশ্বাব্দে বর্ষে সোমদিনে তিথৌ।
ত্রয়োদশ্যাং সিতেপক্ষে মেষে সূর্য্যাস্য সংক্রমে ॥
কৌতুকাদি দ্বিজাগ্র্যেষু পূজিতেষু চ চষ্টসূ।
ভূমি দদৌ শষ্যপূর্ণাং দ্রোণবিংশ নবাধিকাং।
জলাশয়ং দ্বিজায়ে মং ধর্ম্মসাগরমাখ্যায়া।
সভূমি ফলবৃক্ষাদি ভূমিতং দত্তবানহং ॥
মমবংশ পরিক্ষীণে যঃ কশ্চিদ্ভূপতি ভবেৎ।
তস্য দাসস্য দাসোহং ব্রহ্মবৃত্তিং ন লোপয়ৎ ॥"

মর্ম্ম - চন্দ্রবংশোদ্ভব মহামাণিক্যের সুধীপুত্র, শশধর সদৃশ শ্রীশ্রীমদ্ধর্ম্ম মাণিক্য ১৩৮০ শকের মেযসংক্রমণে (চৈত্র মাসের শেষ তারিখে) সোমবার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কৌতুকাদি অষ্ট বিপ্রকে শষ্য সমন্বিত এবং ফল বৃক্ষাদিপূর্ণ ঊনত্রিংশ দ্রোণ ভূমি দান করিলেন। আমার বংশ বিলুপ্ত হইলে যদি এই রাজ্য অন্য কোন ভূপতির হস্তগত হয়, তিনি এই ব্রহ্মবৃত্তি লোপ না করিলে, আমি তাঁহার দাসানুদাস হইব।

এই তাম্রশাসন আলোচনা করিলে তদানীন্তন সমাজের সরল ও উদার ব্যবহারের এক উজ্জ্বল্যমান প্রমান পাওয়া যাইবে। এই ফলকে, ভূমির চতুঃসীমা উল্লেখ করা দূরের কথা, প্রদত্ত ভূমি কোন গ্রাম বা মৌজাই অবস্থিত, তাহারও উল্লেখ করা হয় নাই। সুতরাং এই তাম্রশাসন মূলে গ্রহীতাগণ যে স্থানে ইচ্ছতাঁহাদের স্বত্ব স্থাপন করিতে পারেণ। কিন্তু এইরূপ মিথ্যা বা কপটাচরণ হইতে পারে, সেকালে দাতা বা গ্রহীতা কাহারও মনে সে ভাবের উদ্রেক হয় নাই; ইহা সমাজের উচ্চ আদর্শের নিদর্শন নহে কি ?

তাম্রফলক আলোচনায় জানা যাইতেছে, ধর্ম্মসাগর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ১৩৮০ শকে উক্তশাসন সম্পাদিত হইয়াছিল। সুতরাং উক্তসাগরের প্রাচীনত্ব সার্দ্ধ চারি

ধর্ম্মসাগর (কুমিল্লা)

শতাব্দিরও কিঞ্চিদধিক নির্ণীত হইতেছে। খননের পর, কোন কালেই এই বাপীর সংস্কার হয় নাই, শীঘ্র সংস্কারের প্রয়োজন হইবে বলিয়াও মনে হয় না। আজ পর্য্যন্ত এই সরোবরের জল উৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত। কেহ কেহ মনে করেন, এই জলাশয় মহারাজ দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্যের খনিত, ইহা যে ভ্রম সঙ্কুল উক্তি, পূর্বোক্ত তাম্র শাসন দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

কসবায় ও উদয়পুরে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের প্রতিষ্ঠিত আরো দুইটি ধর্ম্মসাগর বিদ্যমান রহিয়াছে, সেগুলি পূর্বোক্তধর্ম্মসাগরের তুলনায় আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

ধর্ম্মমত পোষণ এবং ধর্ম্মসম্মত কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের নাম সার্থক হইয়াছে। তিনি ১৩৫৩ হইতে ১৩৮৪ শক (১৪৩১-১৪৬২খ্রীঃ) পর্য্যন্ত বত্রিশ বছর কাল সর্ব্ববিধ শান্তির সহিত রাজ্য শাসন করিয়া, বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন। মহারাজ ধর্ম্মের যশোকাহিনী বর্তমান কালেও ত্রিপুরায় সার্ব্বজনীনভাবে ঘোষিত হইতেছে, তিনি ধার্ম্মিকতা বলে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের রাজত্বকাল সর্বোতোভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল। এই সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহাদি কোনরূপ অশান্তিজনক ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় নাই। প্রজাগণ রাজ ছত্র ছায়ায় সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়াছে।

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস 'রাজমালা' বঙ্গভাষায় রচনা করা মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের এক অক্ষয় কীর্তি, এই কীর্তিদ্বারাও তিনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য

ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের স্বর্গারোহণের পর, কূটচক্রী সেনাপতিগণ রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধন্যদেবকে উপেক্ষা করিয়া, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপ দেবকে 'প্রতাপ মাণিক্য' নাম প্রদানপূর্ব্বক সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ধন্যদেবের হিতাকাঙ্খী, সুচতুর রাজ পুরোহিত দেখিলেন, দুর্দ্দান্ত সেনাপতিগণের চক্রান্তে ধন্যদেব রাজত্ব লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা কুমারের জীবন বিনাশ হওয়াও বিচিত্র নহে। তাই তিনি ধন্যদেবকে রাজপুরী হইতে গোপনে বাহির করিয়া নিয়া, স্বীয় ভবনে লুক্কায়িত ভাবে রাখিলেন। ধন্যদেবের ধাত্রী ব্যতীত, ইহা অন্য কাহারও জানা ছিল না।

প্রতাপ মাণিক্যকে ক্রীড়নকরূপে সিংহাসনে বসাইয়া, নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করাই সেনাপতিগণের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। মহারাজ প্রতাপ, অল্প বয়স্ক হইলেও দুষ্ট সেনাপতিগণের অন্যায় প্রাধান্য তিনি মানিয়া লইতেছিলেন না। ইহাতে সেনাপতিগণ রুষ্ট হইয়া, বালক প্রতাপের শিরে অধার্ম্মিকতার অভিযোগ চাপাইয়া, রজনীযোগে তাঁহাকে গুপ্ত হত্যা করিলেন।

অতঃপর সেনাপতিগণ মধ্যে একে অন্যকে অতিক্রম করিয়া সিংহাসন অধিকারের নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হইল, উচ্ছৃঙ্খল সেনানীবৃন্দের অত্যাচারে প্রকৃতিপুঞ্জ সন্ত্রস্ত হইয়া, প্রাণভয়ে নানা স্থানে পলায়ন করিতে লাগিল। সেনাপতিগণের মধ্যে কিয়ৎকাল মারামারি কাটাকাটি পর, প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ বুঝিলেন, রাজকুমার ধন্যদেবকে সিংহাসন প্রদান ব্যতীত উপস্থিত রাষ্ট্রবিপ্লব নিবারণের অন্য উপায় নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষগণও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, তখন ধন্যদেবের তল্লাস চলিল। তিনি কোথায় আছেন, কাহারও জানা ছিল না। সেনাপতিগণ বহু চেষ্টায়ও কুমারের সন্ধান না পাইয়া ধাত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদের মনোগত ভাব জানাইলেন। ধাত্রী দলবদ্ধ সেনাপতিদিগকে দেখিয়া মনে করিলেন, ধন্যের নিধন সাধন দ্বারা রাজ্য লাভের পথ নিষ্কন্টক করিবার অভিপ্রায়ে ইঁহারা বদ্ধ পরিকর হইয়া আসিয়াছেন। সুতরাং তিনি কিছুতেই ধন্যের সন্ধান বলিতেছিলেন না। ধাত্রীর মনোগত ভাব বুঝিয়া প্রধান সেনাপতি শালগ্রাম চক্র স্পর্শ করিয়া শপথপূর্ব্বক বলিলেন,- "ধন্যের অনিষ্ট আশঙ্কা নাই, তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন-করা হইবে।" তখন ধাত্রী আশ্বস্তা হইয়া,

ধন্যদেবের পুরোহিত গৃহে অবস্থানের কথা বলিয়া দিলেন।

অতঃপর সেনাপতিগণ অশ্বগজাদি সমন্বিত বিপুল বাহিনীসহ পুরোহিত ভবনে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে কুমার ধন্যদেব বুঝিলেন, ভ্রাতার ন্যায় তাঁহারও আসন্ন কাল উপস্থিত। তিনি জীবনরক্ষার্থ গৃহ কোণস্থ একটি বাঁশের মাচার নীচে যাইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিলেন। রাজ পুরোহিত বাহিরে আসিয়া সেনাপতিগণের মনোভাব বুঝিয়া লইলেন, এবং তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া কুমার ধন্যের সন্ধান বলিয়া দিলেন। ধন্যদেব অধিকক্ষণ লুক্কায়িত থাকিতে সমর্থ হইলেন না, অনুসন্ধান তৎপর সেনাপতিগণ তাঁহাকে মঞ্চের নিম্নদেশ হইতে টানিয়া বাহিরে আনিলেন। এই সময় ধন্য একাদশ বর্ষ বয়স্ক বালক ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ যমস্বরূপ সেনাপতিগণের হস্তে পতিত হইয়া, নিজকে নিতান্তই নিরাশ্রয় এবং বিপন্ন মনে করিলেন। এবং ভীত চিত্তে বালকোচিত বিনয় বাক্যে বলিলেন, - "আমি রাজ্য লাভের অভিলাষী নহি, পুরোহিত গৃহে ভৃত্য ভাবে থাকিয়া এক মুষ্টি অন্ন দ্বারা জীবন যাপন করিব। তোমরা আমাকে হত্যা করিয়া অনর্থক অপযশ অর্জ্জন করিও না।" রাজ পুরোহিত তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন, - "ইঁহারা তোমাকে হত্যা করিবেন না, সিংহাসনে স্থাপন জন্য লইতে আসিয়াছেন।" এই অবস্থায় সেনাপতিগণ ধন্যদেবকে আনিয়া রাজা করিলেন। ইহা ১৩৮৫ শকের শেষ পাদের ঘটনা।

রাজত্ব লাভ করিয়া মহারাজ 'ধন্যমাণিক্য' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ স্বীয় দুহিতা কমলা মহাদেবীকে রাজকরে অর্পণ করিলেন, তিনিই মহারাজ ধন্যের অগ্রমহিষী।

মহারাজ ধন্য কূর্ম্মনীতি অবলম্বন করিয়া সেনাপতিগণের আনুগত্য স্বীকারে রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অবস্থায় এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, ক্ষমতাগর্ব্বে প্রমত্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণ দিন দিন তাঁহার প্রতি অকুণ্ঠিতভাবে আধিপত্য বিস্তার করিবার প্রয়াসী। তাঁহাদের অসঙ্গত ব্যবহারে মহারাজ উত্তরোত্তর বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সৈনিক বলে বলীয়ান, শাসন যন্ত্র তাঁহাদের মুষ্টিগত, ত্রিপুর রাজলক্ষ্মী তাঁহাদের অঙ্গুলী শঙ্কেতের বশবর্ত্তিনী; রাজার ধন প্রাণ সেনাপতিগণের হাতে, এই অবস্থায় বালক ধন্য, তাঁহাদের দমনোপায় উদ্ভাবনে সমর্থ হইলেন না; অথচ তাঁহাদের আধিপত্য অসহনীয় হইয়া উঠিল।

এই সময় একমাত্র হিতৈষী রাজ পুরোহিতের মন্ত্রণানুসারে রাজা পীড়ার ভাণ করিয়া তিন মাস কাল অন্তঃপুরে গুপ্তগৃহে রহিলেন। সেনাপতিগণ দ্বারা পূর্ব্ববৎ রাজ কার্য্য পরিচালিত হইতে লাগিল। রাজার শ্বশুর ও প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ, পুরোহিতকে বলিলেন, -"সেনাপতিগণ রুগ্ন রাজার দর্শন অভিলাষী।" ইহাদিগকে দমন করিবার উত্তম সুযোগ উপস্থিত মনে করিয়া, রাজ পুরোহিত সেনাপতির বাক্যে সম্মতি দান করিলেন, এবং রাজার সহিত পরামর্শ করিয়া, পর দিবস রাত্রি কালে সেনাপতিদিগকে রাজ অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মহারাজের অঙ্গরক্ষিগণ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। সেনাপতিগণ রাজদর্শনান্তে বিদায় অভিবাদন করিবার কালে, পুরোহিতের ইঙ্গিতানুসারে শরীর রক্ষিগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা নিহত হইলেন। এই উপায়ে দুষ্ট সৈন্যাধ্যক্ষগণকে ধ্বংস করিয়া, মহারাজ ধন্য বিশ্বস্ত লোক দিগকে সৈন্যাধ্যক্ষের পদ প্রদান করিলেন, তন্মধ্যে সেনাপতি রায় কাচাকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তিনি এরূপ পরাক্রান্ত এবং খ্যাতনামা ছিলেন যে, মেকেঞ্জি সাহেব ভ্রমে পতিত হইয়া ইহাকে ত্রিপুরাধীশ্বর 'চয়চাগ মাণিক্য' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।* উক্ত সেনাপতি এবং তাঁহার অনুজ রায় কছম রিয়াং জাতীয় ছিলেন। এই সময় হইতে মহারাজ সৈনিক বিভাগের পরিচালন ও তত্ত্বাবধান ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র ছিল। তখন মহারাজ সৈনিক বল সুদৃঢ় ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার পক্ষে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন।

অতঃপর মহারাজ ধন্য বঙ্গবিজয়ার্থ উদ্যোগী হইলেন। এইবার মেহেরকুল, পাটীকারা, গঙ্গামণ্ডল, বগাসারি, কৈলাগড়, বেজুরা, ভানুগাছ, বিষ্ণাউরী, লঙ্গলা, বরদাখাত প্রভৃতি বর্ত্তমান ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলার অর্ন্তগত অনেক প্রদেশ ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। খণ্ডলবাসিগণ ত্রিপুরেশ্বরের বৈশ্যতা স্বীকার না করায়, তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত, তথায় এক সেনানিবাস স্থাপিত হইয়াছিল। খণ্ডলবাসিগণ ত্রিপুরেশ্বরের লস্করকে ধৃত করিয়া গৌরেশ্বরের নিকট উপস্থিত করায়, গৌড়াধীপের আদেশানুসারে তাঁহাকে হস্তী পদতলে ফেলিয়া বধ করা হয়। এই ঘটনায় মহারাজ ধন্যমাণিক্য ক্রোধে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং বিস্তর সৈন্যসহ সেনাপতি রায় কাচাককে খণ্ডল দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। এই সেনাপতির বাহুবলে খণ্ডলের প্রধান সরদার (বসিক) গণ পরাজিত হইয়া যথাযোগ্য ভেটসহ রাজ সকাশে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ ধন্য ইহাদিগকে নিহত করিয়া, খণ্ডলবাসীদিগকে

* North-East Frontier of Bengal, P.270

বিদ্রোহাচরণের উপযুক্তপ্রতিফল প্রদান জন্য স্বয়ং খণ্ডুলে গমন করিলেন; এবং নরহত্যা ও লুন্ঠনাদি দ্বারা খণ্ডুলের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটাইয়া ছিলেন যে, বৃক্ষপত্র ব্যতীত তাহাদের পরিধানের অন্য সম্বল ছিল না। ইহার পর খণ্ডুল দেশ সম্পূর্নরূপে ত্রিপুরার বশীভূত হইয়াছে।

ইহার অল্পকাল পরে, থানাংচি নামক কুকি প্রদেশে একটি শ্বেতহস্তী ধৃত হইয়াছিল। ত্রিপুরেশ্বর এই হস্তীটি পাইবার অভিলাষী, কিন্তু কুকিরাজ তাহা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। এই সূত্রে তাহার সহিত ত্রিপুরার যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্যমাণিক্য উপযুক্ত যুদ্ধ সম্ভার এ সৈন্যসহ সেনাধ্যক্ষ রায় কাচাককে কুকি প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। রায় কাচাক কৌশলী এবং সুনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু তিনি আট মাসের চেষ্টায়ও উত্তুঙ্গ পর্ব্বতস্থিত কুকিগণের সুরক্ষিত থানাংচি দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতারোহণের উপায় উদ্ভাবনে অসমর্থ হইয়া, সেনাপতি দিন দিন ব্যাকুল ও ভগ্নোৎসাহ হইতে ছিলেন। এই সময় দৈবানুকম্পায় একটি সুবৃহৎ গোধিকা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, এবং সেই গো-সর্পই তাঁহার অভিষ্ট সাধনের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিলেন। গোধিকাটীর কটি দেশে সুদৃঢ় বেত্র বন্ধন করিয়া তাহাকে পর্ব্বতে চড়াইয়া দিলেন। এই ভাবে গো-সাপটি ক্রমে পর্ব্বতে উঠিতে লাগিল, এদিকে ক্রমশঃ সুদীর্ঘ বেত্র যোজনা করা হইতেছিল। এই ভাবে গো-সাপটি পর্ব্বতের সানুদেশে আরোহণ করিবার পর, তাহার কটিদেশে আবদ্ধ বেত্রের হস্তস্থিত ভাগ টানিয়া দেখা হইল, তাহা বিশেষ দৃঢ় হইয়াছে। অতঃপর রাত্রিকালে, সেই বেত্র অবলম্বন করিয়া সৈন্যগণ নীরবে একে একে পর্ব্বতারোহণ করিল; নিদ্রিত কুকি দৈন্যগণ তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। তখন অকস্মাৎ কুকিদিগকে আক্রমণ করিয়া, অল্পায়াসেই দুর্গ জয় করা হইয়াছিল।

মহারাজ ধন্য ১৪৩৫ শকে (১৫১৩ খ্রীঃ) সেনাপতি রায় কাচাকের অধিনায়কত্বে বিস্তর সৈন্য লইয়া স্বয়ং চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। তিনি এই যুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়া গৌড় সৈন্যদিগকে চট্টগ্রাম হইতে বিতারিত করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর হোসেন শা এই পরাজয় বার্তা শ্রবণে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং গৌড়াই মল্লিক নামক সেনাপতিকে বিস্তর সৈন্য, নৌ-বহর ও হস্তী ঘোড়া ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। গৌড় সৈন্য গোমতী নদী পথে কুমিল্লায় আগমন এবং ত্রিপুরেশ্বরের মেহেরকুল আক্রমণ ও জয় করিলেন। ত্রিপুর সৈন্য পশ্চাৎপদ হইয়া চণ্ডীগড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। পাঠান বাহিনী অতঃপর রাজধানী আক্রমণ জন্য কৃতসংকল্প হইল। তাহাদের নৌ-বহর

গোমতীর বক্ষ আচ্ছাদন করিয়া উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ত্রিপুর সেনানী রায় কাচাক প্রবল শক্তিকে বাধা প্রদানের উপায়ান্তর না দেখিয়া, স্বীয় উদ্ভাবিত কৌশল অবলম্বনে, গোমতীর উপরিভাগে (উজানে) সুদৃঢ় বাঁধ দ্বারা জলস্রোত রুদ্ধ করিয়া দিলেন। পার্ব্বত্য নদী একমাত্র পর্ব্বত নিঃসৃত জলদ্বারা একটানা স্রোতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। নদীতে বাঁধ দেওয়ায় স্রোত বন্ধ হইয়া, বাঁধের নিম্ন ভাগ শুষ্ক হইয়া গেল এবং উপরিভাগের জল স্ফীত হইয়া উঠিল। পাঠানগণের অগণিত নৌকা বালুকাময় চরায় আবদ্ধ হইয়া রহিল। এই ভাবে তিন দিন শুষ্ক চরায় নৌকাবক্ষে বাস করা অসহনীয় হওয়ায়, অনেক সৈন্য নৌকা পরিত্যাগ করিয়া, নদীবক্ষে বালুকাময় চরভূমিতে শিবির স্থাপন করিল। এদিকে সেনাপতি রায় কাচাক চতুর্থ দিবস গভীর রাত্রিতে নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলেন, তখন আবদ্ধ জলরাশি স-শব্দে ভীষণ বেগে আসিয়া মুসলমানগণের উপর পড়িল। তাহারা নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছিল, আত্মরক্ষার অবসর ঘটিল না। তাহাদের নৌ-বহর, সৈন্যদল, যুদ্ধ সরঞ্জাম সমস্তই প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গেল। এই অবস্থায় আত্মরক্ষা করাই সেনাপতি গৌড়াই মল্লিকের পক্ষে দুষ্কর হইয়াছিল। তিনি হতাবশিষ্ট অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত হস্তী, ঘোড়া এবং দ্রব্যজাত ত্রিপুর সেনানীর হস্তগত হইল। এই সময় একটি পতাকা ও একটি তোপ মুসলমানের হস্ত হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। তোপটি* আগরতলায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে, এবং পতাকাটি রাজাজ্ঞায়, রিয়াং সম্প্রদায়ের রায় (প্রধান সরদার) পরম্পরা বিজয়ের নিদর্শন স্বরূপ ব্যবহার করিতেছেন।

গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের এই পরাজয় কলঙ্ক অসহনীয় হইল। তিনি পুনর্ব্বার হৈতন্ খাঁ ও করা খাঁ নামক সেনাপতিদ্বয়ের অধিনায়কত্বে বিপুলবাহিনী ত্রিপুরা আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন। এই অভিযানে একশত হস্তী, পঞ্চ সহস্র ঘোটক ও একলক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল। এতদ্ব্যতীত দ্বাদশ বাঙ্গালার (বারভূঁঞাগণের) প্রদত্ত সৈন্যবলও এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিল। এবার পাঠান সৈন্য গোমতী পথে না আসিয়া কৈলারগড়ের পথে আগমন করিল।

পাঠানবাহিনী জামিরখাঁ গড় ও ছয়ঘড়িয়া গড় জয় করিয়া, ডোমঘাটি নামক স্থানে যাইয়া ছাউনী করিল। এই সময় ত্রিপুর সৈন্যগণ পর্ব্বতজাত বিষলতা গোমতী গর্ভে নিক্ষেপ দ্বারা নদীর জল বিষাক্তকরায়, সেই জল পান করিয়া কতিপয় পাঠান সৈন্য

---

* বর্ত্তমানে ইহা বাজারে-মধ্য রাজপথ ও মোগড়া সড়কের সংযোগ স্থলে স্থানান্তরিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

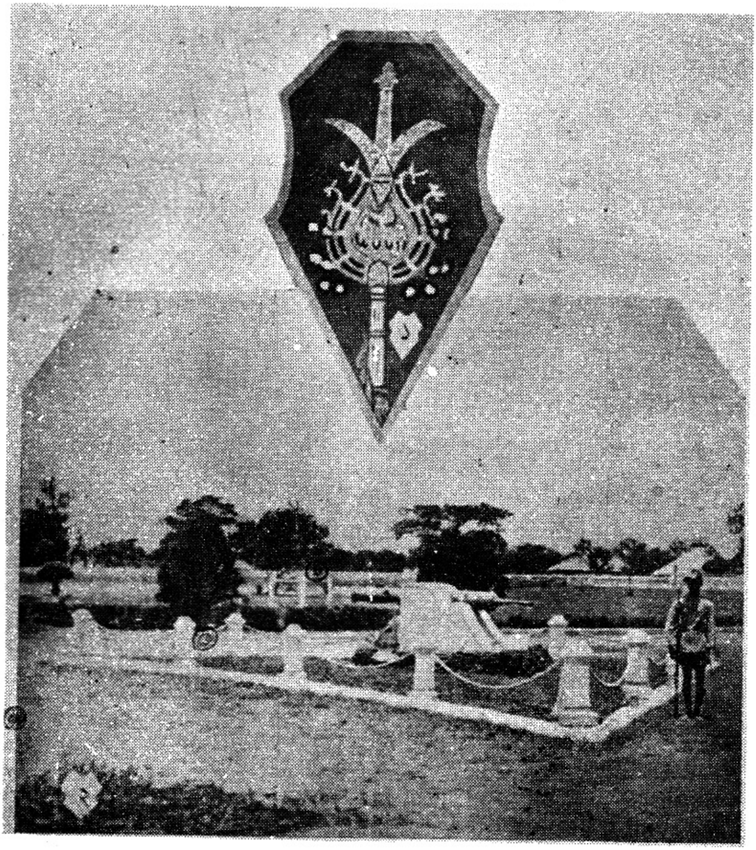

মহারাজ ধন্যমাণিক্যের বিজিত বস্তুদ্বয়—

(১) গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের পতাকা।

(২) „ হোসেন শাহের তোপ।

মৃতুমুখে পতিত হইয়াছিল। মুসলমানগণ এই ষড়যন্ত্র জানিতে পাইয়া নদীর জল ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিল এবং দুই প্রহর কাল মধ্যে এক দীঘিকা খনন করিয়া ব্যবহার্য্য জলের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। এই জলাশয় মুসলমানগণের খনিত বলিয়া 'তুরুক দীঘি' নামে অভিহিত হইয়াছে। জলাশয়টি মহারাজ দেবমাণিক্য কর্ত্তৃক পুনঃসংস্কৃত হইয়াছিল, তাহার অস্তিত্ব অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

এবারও ত্রিপুর সেনাপতি রায় কাচাক পূর্ব্ব পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এবার গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়া সাত দিবস স্রোত বন্ধ রাখা হয়। পাঠানগণ পূর্ব্ববারের দুর্গতির কথা স্মরণ করিয়া প্রথমতঃ নদী গর্ব্ভে নামিতে সাহসী হইল না; যখন দেখা গেল দীর্ঘকাল নদীর অবস্থা একরূপই আছে তখন পার্ব্বত্য বন্ধুর পথ অপেক্ষা শুষ্ক নদীপথ বিশেষ সুগম ও সুবিধাজনক মনে করিয়া, তাহারা রজনীযোগে গোপনে নদীপথ ধরিয়া পদব্রজে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ত্রিপুর সৈন্যগণ অন্তরালে থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। মুসলমানগণ নদী গর্ব্ভে নামিয়া আরামের সহিত উজানের দিকে যাইবার কালে, নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায়, এক সপ্তাহের সঞ্চিত বারিরাশি ভীষণ বেগে আসিয়া তাহাদের উপর পড়িল। সেই প্রবল স্রোতের মুখে সহস্র সহস্র ভেলা ভাসিয়া আসিতেছিল, প্রত্যেক ভেলায় মনুষ্যাকৃতি তিনটি করিয়া পুতুল এবং প্রত্যেক পুতুলের হস্তে প্রজ্জ্বলিত মশাল ছিল। মুসলমানগণ নদী বেগ হইতে আত্মরক্ষা লইয়াই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর আবার মশাল হস্তে অসংখ্য সৈন্য আসিতেছে মনে করিয়া ভীত ও হতাশ হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে ত্রিপুর সৈন্যগণ পশ্চাদ্ভাগস্থ পার্ব্বত্য অরন্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলন দ্বারা পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া নদীর দুই পার হইতে মুসলমানগণকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিল। সম্মুখে জলপ্রবাহ ও অসংখ্য ভেলা আরোহী সৈন্যকল্প পুতুল, পশ্চাৎ ভাগে দাবানল এবং উভয় পার্শ্বে শত্রু সৈন্য, এহেন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া হৈতন খাঁ ও করা খাঁ প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত সর্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন, সৈন্য দলের মধ্যে অধিকাংশ সলিল সমাধি লাভ এবং শত্রু হস্তে জীবন বির্সজ্জন করিল। ধৃত সৈন্যগণকে চতুর্দ্দশ দেবতা সমক্ষে বলিদান করা হইয়াছিল।

অল্পকাল পরে পাঠান সৈন্যগণ পুর্নবার চট্টগ্রামে আগমন করায়, মহারাজ ধন্যমাণিক্য তথায় যাইয়া চট্টগ্রাম পুনরাধিকার এবং পাঠানদিগকে বিতাড়িত করিয়া সেনা নিবাস স্থাপন করিলেন। অতঃপর আরাকান (রসাঙ্গ) রাজ্য আক্রমণ ও কিয়দংশ অধিকার করিয়া, বিজিত প্রদেশে এক সেনা নিবাস স্থাপন ও একটি পুষ্করিণী

করাইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে বিজয়ী সেনাপতিকে 'রসাঙ্গমৰ্দ্দন নারায়ণ' উপাধি প্রদান করা হয়। এই সেনাপতি রসাঙ্গের অপরাংশ বিজয়ে অসমর্থ হওয়ায়, তাঁহার সাহায্যার্থ, প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতি রায় কাচাক ও রায় কছমকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে হোসেন শাহ ত্রিপুরা পুনরাক্রমণের নিমিত্ত বিস্তর সৈন্য নিয়োগ করায় ত্রিপুরেশ্বরকে এযাত্রায় আরাকান বিজয়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইহা ১৪৩৭ শকের (১৫১৫ খ্রীঃ) ঘটনা।

হোসন শাহের তৃতীয় বারের অভিযানে মুসলমানগণ প্রথমতঃ কৈলাগড় (কসবা) দুর্গ আক্রমণ করে। কৈলাগড়ের পশ্চিম দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী এক মাইল দূরে বিজয় নদীর তীরে পাঠান শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন এখনও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। রাজমালায় কিছুমাত্র এ বিষয়ের উল্লেখ নাই। এই সময় কৈলাগড়ের যুদ্ধে ত্রিপুর বাহিনী পরাজিত ও ত্রিপুরার কিয়দংশ হোসেন শাহের কুক্ষিগত হইবার আভাস পাওয়া যায়। সুবর্ণ গ্রামে অবস্থিত মসজিদের শিলালিপি আলোচনায় জানা যায়, সুলতান হোসেন শাহের শাসনকালে ইক্লাম মোয়াজ্জমাবাদের উজীর এবং ত্রিপুর ভূমির শাসন কর্ত্তা খওয়াস খাঁ ৯১৯ হিজরী সনে উক্তমসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। * শিলালিপিতে উৎকীর্ণ "ত্রিপুরা ভূমির শাসন কর্ত্তা" বাক্যদ্বারা ত্রিপুরার কিয়দংশ মুসলমাণের হস্তগত হইবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই যুদ্ধে ত্রিপুরেশ্বর পরাজিত হইয়া থাকিলেও তদ্দরুণ ত্রিপুরার বিশেষ কিছু ক্ষতি হইয়াছিল না, এবং যে সামান্য ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা উদ্ধার করিতে অধিক বিলম্ব ঘটে নাই।

পাঠান সেনাপতি ছুটি খাঁ এর অনুজ্ঞায় কবি শ্রীকর নন্দী কর্ত্তৃক ১৫৮৬শকে অশ্বমেধ পৰ্ব্ব রচিত হইয়াছিল, এই গ্রন্থ "ছুটি খাঁনের মহাভারত" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হোসেন শাহের পূৰ্ব্বোক্ত অকিঞ্চিৎকর বিজয়ের সূত্র ধরিয়া, শ্রীকর নন্দী তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভ ভাগে লিখিয়াছেন,-

"তান এ সেনাপতি লস্কর ছুটিখান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান॥
ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পৰ্ব্বত গহবরে গিয়া করিল প্রবেশ॥

* Journal of Asiatic Society of Bengal, - Vol. XII P. P. 333-334

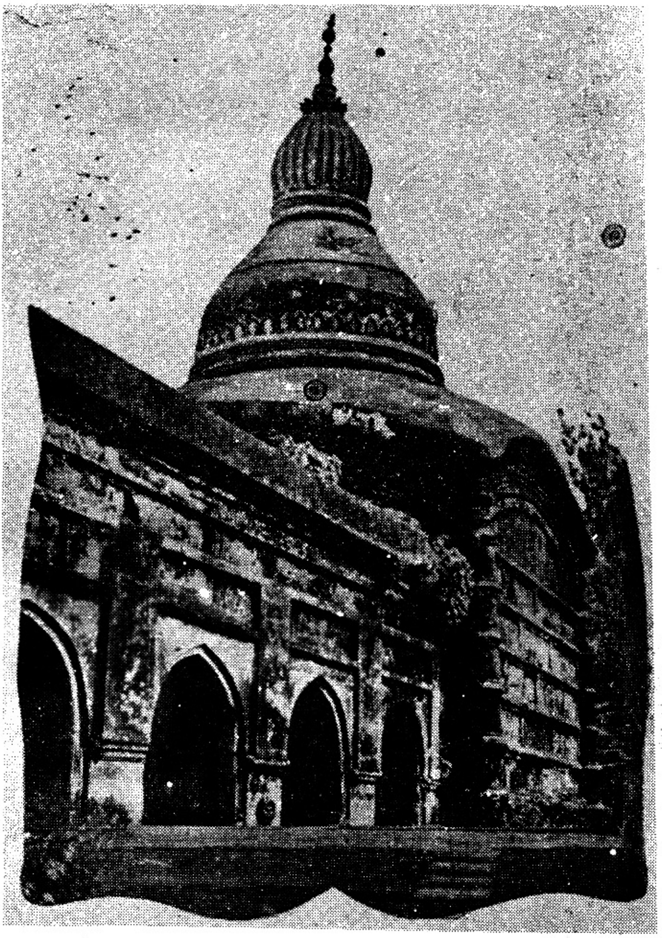

ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর মন্দির (উদয়পুর)

গজ বাজী কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তার পুরীর নির্ম্মাণ ॥
অদ্যাপি ভয় না দিল মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি ॥ ” ইত্যাদি।

ইহা আশ্রয়দাতাকে বীরেন্দ্র সমাজে উচ্চ আসন প্রদান পক্ষে কবির ব্যর্থ প্রয়াস ব্যতীত আর কিছু নহে। ত্রিপুরেশ্বরের হস্তে হোসেন শাহের বারম্বার দুর্গতি ভোগের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তৎসমস্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে, পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা তোষামদকারী কবির অতিরঞ্জিত স্তাবকতা মাত্র।

মহারাজ ধন্য বীর পুরুষ ছিলেন, সুতরাং তিনি বীরের মর্য্যাদা বুঝিতেন। কার্য্যক্ষম সেনাপতিদিগকে পুরস্কার ও উপাধি দানে গৌরবান্বিত করিতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। সৈনিক বিভাগের কর্মচারীদিগকে ভোজ দানে সন্তুষ্ট করা হইত। তাঁহার প্রদত্ত একটি ভোজের কথা ঘটনাক্রমে চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

মহারাজ, ধন্যসাগরের তীরে সৈনিকদিগকে এক বিরাট ভোজ দিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে জ্ঞাতি ওবং ব্রাহ্মণগণের ভোজনেরও ব্যবস্থা ছিল। রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে; -

“দ্বিজ জাতি ভোজন করায় নৃপবর।
আর খাওয়াইল সৈন্যসেনা বহুতর ॥”

এই ভোজে সামাজিক প্রথা রক্ষার পক্ষে উপযুক্ত যত্ন নেওয়া হইয়ছিল, রাজমালার বাক্য দ্বারাই তাহা জানা যায়; -

“সাগরের চারি পাড়ে বৈসায় নানা জাতি।
রন্ধন ভোজন তথ যার যেই পংক্তি॥”

এরূপ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও বিধাতার ইচ্ছায় এই ভোজে যে ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাহা অভাবনীয়। এই ঘটনা সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে, -

"সেই স্থানেতে রাজা মঞ্চেতে বসিল।
কুকির সরদারে সেনা গণিতে বলিল ॥
সেনাগণে রন্ধন ভোজন করে সুখে।
সরদার গণিবারে গেলেন সম্মুখে ॥
সেনা অন্ন যষ্ঠি লৈয়া স্পর্শিয়া গণিল।
খাইতে ছুইল যাকে কাঠিছোঁয়া হৈল ॥
* * * * *
এইমতে কাঠিছোঁয়া নাম কত সেনা।
শ্রীধন্য মাণিক্যাবধি হইল গণনা ॥"

উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা জানা যায়, সৈন্যগণের ভোজনকালে কুকি সরদার ভাতের কাঠিদ্বারা স্পর্শ করিয়া সে সকল সৈন্যকে গণনা করিয়াছিল, তাহারাই 'কাঠিছোঁয়া' নামে অভিহিত ও জাতিচ্যুত হইয়াছে। লং সাহেবের মতে কুকি জাতীয় কতক লোক 'কাঠিছোঁয়া' হইয়াছিল। * এই উক্তি গ্রহণীয় নহে, কোন কুকির আহার কালে অন্য কুকি তাহাকে স্পর্শ করিবার দরুণ ভোক্তার জাতি চ্যুতি ঘটিবার কারণ হয় না। প্রকৃত পক্ষে ত্রিপুরা ও বাঙ্গালী প্রভৃতি যে সকল সৈন্যকে কাঠি দ্বারা স্পর্শ করা হইয়াছিল, তাহারাই জাতিভ্রষ্ট এবং কাঠিছোঁয়া নামে অভিহিত হইয়াছে। এই সম্প্রদায় নানা জাতীয় হিন্দুর সমবায়ে গঠিত এবং একটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়া থাকিলেও ত্রিপুরা জাতির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য কেবল শৌর্য্যবীর্যশালী ছিলেন এমন নহে, অসাধারণ ধার্ম্মিকও ছিলেন। তিনি ভূমিদান, জলাশয় খনন, দেবালয় গঠন, দেবতা প্রতিষ্ঠাদি বহুবিধ সৎকার্য্য সম্পাদনদ্বারা চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি এক মণ সুবর্ণ দ্বারা শ্রীশ্রী ভুবেনশ্বরী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া, এক উৎকৃষ্ট ইষ্টকালয়ে তাহার প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে এই মূর্ত্তির অস্তিত্ব নাই, সম্ভবতঃ উদয়পুর আক্রমণকারী মুসলমাণ বা মঘ কর্ত্তৃক তাহা লুন্ঠিত হইয়া থাকিবে।

পীঠদেবী শ্রীশ্রী ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর মন্দির মহারাজ ধন্যমাণিক্যের সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি। মন্দিরের গাত্রস্থ শিলালিপি আলোচনায় জানা যায়, এই মন্দির ১৪২৩ শকে নির্ম্মিত হইয়াছে। মহারাজ ধন্য চট্টগ্রাম হইতে দেবীমূর্ত্তি আনিয়া এই মন্দির প্রতিষ্ঠা

* Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol. XIX.

চতুর্দ্দশ দেবতার প্রাচীন মন্দির (উদয়পুর)

করেন। মন্দিরটি নির্ম্মাণের পর অনেকবার সংস্কার করা হইয়াছে। এই মন্দির বিষ্ণু বিগ্রহ স্থাপনোদ্দেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল, মহারাজ ধন্য স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া উক্তমন্দিরে বিষ্ণু মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে দেবী বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন। মন্দিরটি চারিশত বৎসরের ঊর্দ্ধ কালের প্রচীন।

উদয়পুরের ভৈরব (মহাদেব) বিগ্রহ মহারাজ ধন্যমাণিক্যের অন্যতর কীর্ত্তি। এই বিগ্রহের মন্দিরও তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, কালক্রমে তাহা বিনষ্ট হওয়ায় মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য মন্দিরটি পুনঃনির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উদয়পুরে এই মহারাজের প্রতিষ্ঠিত আরও কতিপয় মঠ ও মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তন্মোধ্যে চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরের নাম উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রনাথ তীর্থস্থিত শ্রীশ্রীস্বয়ম্ভুনাথের মন্দির ধন্যমাণিক্যের সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি।

উদয়পুরস্থ সুবিশাল ধন্যসাগর মহারাজ ধন্যমাণিক্যের আরও একটি কীর্ত্তি। এই বিশালবাপী দৈর্ঘ্যে ১০০০ গজ ও প্রস্থে ২৭ গজ, ইহার গর্ভ্তে আট দ্রোণ বার কাণি ভূমি পতিত হইয়াছে। বরদাখাত পরগণায়ও ইঁহার খনিত একটি জলাশয় আছে।

ধন্যমাণিক্যের পট্ট মহিষী মহারাণী কমলা মহাদেবী পতির যোগ্যতর মহিষী ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কসবার সুবিখ্যাত কমলা সাগর অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। এই সরোবরের জল সুনির্ম্মল এবং স্বাস্থ্যকর বলিয়া চির-প্রসিদ্ধ । এতদ্ব্যতীত উদয়পুরেও আর একটি কমলাসাগর এবং মহারাণীর প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে।

মহারাজ ধন্য বঙ্গভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আদেশে প্রেত চতুর্দ্দশীর গীতি, রামায়ণ, উৎকলখণ্ড পাঁচালী এবং যাত্ররত্নাকর রচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে সেই সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। মহারাজ সঙ্গীত শাস্ত্রেরও পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ত্রিহুত হইতে নৃত্যগীতজ্ঞ লোক আনিয়া রাজ্য মধ্যে সঙ্গীত শিক্ষা দান পক্ষে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন, এই যত্নের ফল ত্রিপুরাবাসিগণ বর্ত্তমান কালেও অল্পাধিক পরিমাণে ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

মহারাজ ধন্য মাণিক্যের অতুল প্রতিভা বিষয়ক অনেক কথা বলা যাইতে পারিল না। তাঁহার বত্রিশ বৎসর ব্যাপী রাজ্যকাল মধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা

সঙ্ঘটিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা অল্প কথায় বলিবার নহে৷ মহারাজ শান্তির সহিত রাজ্য ভোগ করিয়া ১৪৩৭ শকে (১৫১৫ খ্রীঃ) বসন্ত রোগে মানবলীলা সম্বরণ করেণ। সাধ্বী মহারানী কমলা মহাদেবী পতির সহগামিনী হইয়া বৈধব্য দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ ও সতীধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন।

১। শ্রীশ্রীজয়কালীর মন্দির
২। কমলাসাগর

মহারাজ বিজয়মাণিক্য

মহারাজ ধন্যমাণিক্যের পুত্র মহারাজ দেবমাণিক্য, মিথিলা নিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ নামক এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের বিভূতি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি শ্মশান-সাধন কালে উক্ত দুষ্ট গুরু কর্ত্তৃক নিহত হন।

দেবমাণিক্যের বিজয়দেব ও ইন্দ্রদেব নামক দুই কুমার বিদ্যমান ছিলেন। মহারাজ দেবমাণিক্যকে নিহত করিয়া, লক্ষ্মীনারায়ণ ইন্দ্রদেবের জননীকে (বিজয়মাণিক্যের বিমাতা) বাধ্য করিয়া, রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। তিনি চক্রান্ত করিয়া, জ্যেষ্ঠ বিজয়দেবকে হীরাপুর নামক স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া, শিশু ইন্দ্রদেবকে সিংহাসনে বসাইলেন এবং অপ্রাপ্ত-বয়স্ক রাজার পক্ষে স্বয়ং শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। ক্ষমতা গর্বে লক্ষ্মীনারায়ণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া, প্রতিনিয়ত অনাচার অত্যাচারে অল্পকাল মধ্যেইপ্রকৃতিপুঞ্জকে জর্জরিত করিয়াছিলেন। এই সময় প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ বুঝিলেন, এই দুষ্ট ব্রাহ্মণকে নিহত করা না হইলে, রাজ্যের উপদ্রব নিবারিত হইবার নহে। ব্রাহ্মণও সেনাপতিগণের মনোভাব না বুঝিতেন এমন নহে; তিনি নিজকে নিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে আড়াইশত মৈথিল সৈন্য দেহরক্ষী রূপে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।

দৈত্যনারায়ণ প্রমুখ সেনাপতিগণ একদা দ্বিপ্রহরকালে ব্রাহ্মণকে সংবাদ দিলেন-'মহারানী অকস্মাৎ পীড়াক্রান্তা হইয়াছেন, তাঁহার অবস্থা নিতান্তই সঙ্কটাপন্ন, শীঘ্র রাজবাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে দেখুন।' এই সংবাদ পাইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ ব্যস্তভাবে চতুর্দ্দোলারোহণ করিয়া রাজভবনে চলিলেন। নদী পার হইবার কালে, সেনাপতিগণের নিয়োজিত লোকেরা পথিমধ্যে ব্রাহ্মণকে ধৃত ও নিহত করিল। অতঃপর দৈত্যনারায়ণ রাজঅন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া, ইন্দ্র মাণিক্যকে আছাড়িয়া বধ করিলেন এবং তাঁহার জননীকে সকলে বেড়িয়া হত্যা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের নিয়োজিত মৈথিল সৈন্যগণ কতক নিহত হইল, কতক পলায়নপর জীবন রক্ষা করিল।

ইহার পর সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ হীরাপুরে সসৈন্যে যাইয়া বিজয়দেবকে বন্ধন মুক্তকরিলেন, এবং তাঁহাকে শুভক্ষণে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া 'বিজয় মাণিক্য' নাম ঘোষণা করা হইল। মহারাজ বিজয় ১৪৫০ শকে (১৫২৮ খ্রীঃ) সিংহাসন লাভ

করিয়াছিলেন। দৈত্যনারায়ণের দুহিতা মহারানী পুণ্যবতী মহাদেবী বিজয়মাণিক্যের প্রধানা মহিষী হইলেন। তাঁহার নামান্তর লক্ষ্মীবালা মহাদেবী।

দৈত্যনারায়ণ, মহারাজ বিজয়ের প্রতি সদয় ব্যবহার করিলেন সত্য, কিন্তু আত্ম-প্রাধান্য বিস্তার করিতে ভুলিলেন না। রাজ ভাণ্ডারের সমস্ত বস্তু এমন কি, হস্তী ঘোড়া পর্য্যন্ত নিজ অধিকারে লইয়াছিলেন, রাজা স্বয়ং চাহিয়াও প্রয়োজনমতে তাহা পাইতেন না। দৈত্যনারায়নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্ল্লভ নারায়ণ অগ্রজের বলে বলীয়ান হইয়া রাজ্যে নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিল, হাটে বাজারে পর্য্যন্ত তাহার অত্যাচার অবাধে চলিতেছিল। সুন্দরী বধূ ও কন্যা প্রভৃতিকে নিরাপদে রক্ষা করা প্রকৃতিপুঞ্জের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। রাজদ্বারে বিচার প্রার্থী হইয়াও কেহ ফলভাগী হইত না; কারণ দুর্ল্লভ নারায়ণের অত্যাচার নিবারণ করা রাজার সাধ্যের অতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহারাজ বিজয় প্রতিকারে অক্ষম হইয়া ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত চিত্তে নীরব থাকিতেন, দৈত্যনারায়ণের প্রভাবে মুখ ফুটিয়া কথা বলিবার উপায় ছিল না।

অবিরত ভ্রাতৃযুগলের উপদ্রবে জর্জ্জরিত হইয়া মহারাজ বিজয় দৈত্যনারায়ণকে বধ করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষোল বৎসর মাত্র। সৈন্য সামন্ত সমস্তই দৈত্যনারায়ণের হস্তে, সুতরাং তাঁহাকে প্রকাশ্যে বধ করিবার উপায় নাই। মহারাজ বিজয় অনেক চিন্তার পর গুপ্ত হত্যার প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। দৈত্যনারায়ণের জ্যেষ্ঠা কন্যার পতি মাধব, দৈত্যনারায়ণের সংসার ভুক্ত ছিলেন, দৈত্যনারায়ণ এই জামাতার একান্ত বাধ্য; এমন কি, আহার্য্য বস্তু পর্য্যন্ত মাধব স্বহস্তে প্রদান না করিলে তিনি আহার করিতেন না। মহারাজ বিজয় ইহার দ্বারাই অভিষ্ট সাধনের প্রয়াসী হইলেন। রাজার প্রস্তাবে প্রথমতঃ মাধব অসম্মত হইয়াছিলেন, পরিশেষে ভূষণার লস্করের পদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দ্বারা তাঁহাকে বাধ্য করা হয়। একদিবস রাত্রিকালে মাধব দৈত্যনারায়ণকে আহার্য্য প্রদানকালে অতিরিক্ত মদ্যপান করাইয়া জ্ঞানহারা করিলেন এবং তরবারির আঘাতে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া গৃহে অগ্নিসংযোগ করিলেন। প্রবল অগ্নিতে দৈত্যনারায়ণের ধন সম্পত্তি সমস্ত গৃহ দগ্ধ হইয়া গেল, সর্ব্বত্র প্রচার করা হইল, মদিরা বিহবল দৈত্যনারায়ণ গৃহের সহিত দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

কিয়দ্দিবস পর মহারানী পুণ্যবতী জানিতে পাইলেন, তাঁহার পিতা মাধব কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। তখন তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধা হইলেন, কিন্তু রাজার ভয়ে

মনোভাব গোপন রাখিয়া সুযোগ অম্বেষণ করিতেছিলেন। একদা মহারাজ মৃগয়া ব্যপদেশে কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত রাজধানীর বাহিরে গিয়াছিলেন, এই সময় মহারানী রাজার আদেশ উল্লেখে মাধবকে আনাইয়া, অন্য এক ব্যক্তি দ্বারা বধ করাইলেন। মহারাজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মাধবের বধ সাধনকারীর প্রাণদণ্ড করিলেন এবং মহারানীকে বনবাসে দণ্ডিতা করিয়া হীরাপুরে পাঠাইলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি পুনরায় মহারানীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইতিমধ্যে অন্য এক বিবাহ করিয়াছিলেন।

মহারাজ স্বীয় শাসন দৃঢ় করিয়া, দেশ বিজয়ের কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি খাসিয়া রাজ্যের কিয়দংশ ও শ্রীহট্ট প্রদেশ জয় করিলেন। এই ঘটনায় জয়ন্তিয়া রাজ ভীত হইয়া, ত্রিপুরেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং উপঢৌকন প্রদান দ্বারা বশ্যতা স্বীকার করেন। মহারাজ বিজয় তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পাঁচটী হস্তী ও দশটি ঘোটক উপহার প্রদান করিয়াছিলেন; জয়ন্তিয়া-রাজ্যের প্রার্থনানুসারে আর একটি হস্তিনী বাচ্চাসহপ্রদান করা হইয়াছিল। তিনি স্বরাজ্যে যাইয়া প্রচার করিলেন, 'ত্রিপুরেশ্বর ভীত হইয়া আমাকে হস্তী উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন।'

এই বার্ত্তা মহারাজ বিজয়ের কর্ণগোচর হইলে, তিনি জয়ন্তিয়াপতির অসঙ্গত স্পর্দ্ধায় কোপান্বিত হইলেন, এবং তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিবার নিমিত্ত দ্বাদশ সহস্র 'হাঁড়ি' জাতীয় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। দুর্ব্বলের প্রতি অস্ত্রধারী সৈন্য নিয়োগ করা তিনি প্রয়োজন মনে করেন নাই, এজন্যে হাঁড়ির অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। এই অভিযানের চিত্র রাজমালায় নিম্নলিখিত রূপ প্রদান করা হইয়াছে;-

"দ্বাদশ রাজার হাঁড়ি হাতে কোদল লৈয়া।
হাঁড়িয়ে ডগর বাদ্য চলে বাজাইয়া॥
চারি মাস হাঁড়ি সৈন্য পাইয়া বেতন।
মদ্য শূকর খাইয়া করিলেক রণ॥
ঘুর ঘুরি শব্দ করি ডগর বাজায়।
সাজনি সাজিয়া সব হাঁড়ি সৈন্য যায়॥
* * * * *

ঢেমস্ ডগর বাজে নাচে উর্দ্ধ হাতে।
শূকর বেদান লাঠি পাকাইয়া মাথে॥" ইত্যাদি।

এই অভিযান যেমন হাস্যোদ্দীপক, তেমনি জয়ন্তিয়া রাজ্যের পক্ষে অপমানজনক হইয়াছিল। এই ঘটনায় জয়ন্তিয়া পতি ভীত ও লজ্জিত হইয়া হেড়ম্বশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। হেড়ম্বরাজ নির্ভয় নারায়ণের অনুরোধে মহারাজ বিজয়, জয়ন্তিয়া রাজকে ক্ষমা করিয়া হাঁড়ি সৈন্য ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক জয়ন্তিয়া রাজর নামও 'বিজয় মাণিক' ছিল। তিনি হেড়ম্বশ্বরের অনুরোধে এবং মধ্যবর্ত্তীতায় ত্রিপুরেশ্বরের ক্ষমা লাভ করিলেন সত্য, কিন্তু এই দারুন অপমানের কথা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। প্রতিহিংসা পরতন্ত্র জয়ন্তিয়া রাজ, ত্রিপুর রাজস্থ কিরাতদিগকে বশীভূত করিয়া, তাহাদের সাহায্যে মহারাজ বিজয়ের কৃত অপমানের প্রতিশোধ লইতে প্রয়াসী হইলেন।

মহারাজ বিজয়ের ন্যায় রাজনীতি কুশল ও কূটনীতিজ্ঞ ভূপতির নিকট এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা গোপন রহিল না। তিনি জয়ন্তিয়া রাজের কার্য্যের প্রতিবাদ না করিয়া, আত্মবল দৃঢ় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেকালে জয়ন্তিয়া রাজ্যের প্রত্যন্তবাসী ত্রিপুরেশ্বরের প্রজা 'সাখাচেপ' ও 'থাঙ্গচেপ' আখ্যাত হালামগণ নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও পরাক্রমশালী ছিল। ইহাদের বাহুবলে ত্রিপুর ভুপতিবৃন্দের রাজ্যের সীমা রাজ সম্মান অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহারা ত্রিপুরেশ্বরের বিশেষ অনুরক্ত প্রজা হইলেও রাজনীতি কুশল মহারাজ বিজয় এই সময় তাহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না।জয়ন্তিয়া পতির কুহকে ভুলিয়া কোনরূপ বিরূদ্ধাচরণ না করে তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা সঙ্গত মনে করিলেন।

অতঃপর মহারাজ পূর্ব্বোক্ত হালামদিগকে রাজধানীতে আহবান করিয়া, চির-বশ্যতা বিগর্হিত কার্য্যে লিপ্ত না হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করাইলেন, এবং সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষুন্ন ও চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে ধাতু নির্ম্মিত বিতস্তি পরিমিত এমটি হস্তী ও একটি ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত মূর্ত্তিদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশে বঙ্গাক্ষরে নিম্নলিখিত সংস্কৃত বাক্যাবলী উৎকীর্ণ হইয়াছে;-

"পূর্ব্বা পৌর্য্য ক্রমাদ্ভবন্ত আত্মীয়া
ইদানীং যদি বৈপরিত্যমাচরন্তি

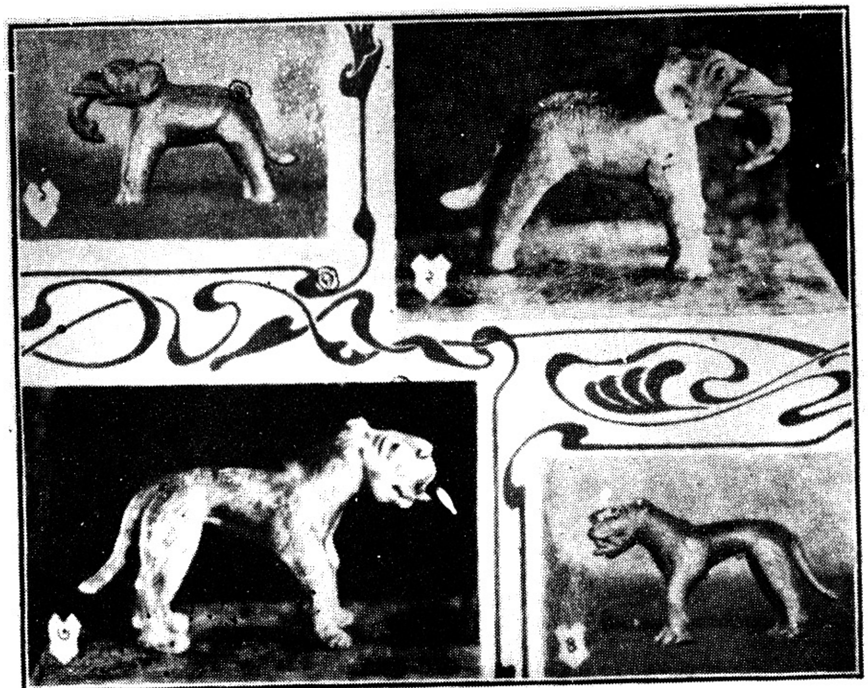

বিজয় মাণিক্যের শাসন

তদোপরি ধর্ম্মঃ শস্যনাশোভবি *
ষ্যতি পশ্চাদগজ শার্দ্দূলৌ ।।"

এই বাক্যবলী বিশুদ্ধ এবং বিস্পষ্ট নহে; ইহা ইঙ্গিতবাণী মাত্র। লিপির কোন কোন অংশ ক্ষয়হেতু অস্পষ্ট হওয়ায়, আয়তন বর্দ্ধক কাঁচের (Magnifying glass) সাহায্যে পাঠ করিতে হইয়াছিল। আমরা অতিকষ্টে ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছি। এই সাঙ্কেতিক বাক্যের স্থূলমর্ম্ম এই;-

"তোমাদের সহিত পূর্ব্বাপর যে আত্মীয়তা চলিয়া আসিতেছে, ইদানীং যদি তাহার বিপরীত আচরণ কর, তবে তোমাদের ধর্ম্ম ও শষ্য নষ্ট হইবে, এবং পশ্চাৎ গজ ও শার্দ্দূল কর্ত্তৃক তোমরাও বিনষ্ট হইবা।"

হালামগণ কুকীরই একটি শাখা। ইহারা দুর্দ্ধর্ষ হইলেও সাধারণতঃ ধর্ম্ম ভীরু এবং রাজভক্ত; রাজাকে তাঁহারা সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জানে। স্বকৃত শষ্যই ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র সম্বল। ইহারা অরণ্যবাসী, সুতরাং প্রবলরিপু আরণ্য হস্তী ও ব্যাঘ্র ইহাদের চির সহচর এবং এই সকল শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত ইহাদিগকে সর্ব্বদা সর্তক থাকিতে হয়। তাহারা প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্ট হইলে, পূর্ব্বোক্ত রাজ শাসনে ধর্ম্ম ও শষ্য নষ্ট, এবং গজ ও শার্দ্দূল কর্ত্তৃক নিহত হইবার ভীতিসঙ্কুল অনুজ্ঞা থাকায়, হালামগণ সেই আজ্ঞাকে দেবতার আদেশ জ্ঞানে, বংশ পরম্পরা বিশেষ সর্তকতার সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আসিতেছে; এবং উক্ত মূর্ত্তিদ্বয়কে দেবতাজ্ঞানে ভক্তির সহিত অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

এই মূর্ত্তিদ্বয় মহারাজ বিজয়ের রাজনীতিক গাম্ভীর্য্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে উগ্রস্বভাব অসভ্য হালামগণের কর্কশ হৃদয়ে রাজ ভক্তির বীজ চিরস্থায়ী করা সম্ভব হইত কিনা, বর্ত্তমান কালে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য নহে।

অতঃপর মহারাজ বিজয়, চট্টগ্রাম বিজয়ের নিমিত্ত দুই সহস্র সৈন্যসহ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন। প্রচণ্ড উজীর, এক সহস্র বাঙ্গালী ও কতক পাঠান সৈন্য লইয়া মেহেরকুল গড়ে অপেক্ষা করিতেছিলেন। পাঠানগণের দুই মাসের বেতন বাকী

* পাঠের প্রথমাবধি "শস্যনাশোভবি" পর্যন্ত গজ পৃষ্ঠে এবং পরবর্ত্তী অংশ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

থাকিবার অছিলায় তাহারা হঠাৎ ক্ষিপিয়া উঠিল, এবং প্রচণ্ড উজীরকে নিহত করিল।অতঃপর সমস্ত পাঠান সৈন্য মধ্যে ষড়যন্ত্র চলিল। তাহারা রাজাকে বধ ও উদয়পুর রাজধানী লুন্ঠনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিল, এই সময় মদিরা উন্মত্তাবস্থায় তাহাদের মধ্যে কলহ হওয়ায়, সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। মহারাজ বিজয় তাহাদের এই উচ্ছৃঙ্খলতার দণ্ড স্বরূপ পাঠান জাতীয় এক সহস্র অশ্বারোহী ও বহু পদাতিক সৈন্যকে চতুর্দ্দশ দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট পাঠানগণ পলায়নপর হইয়া জীবন রক্ষা এবং বঙ্গেশ্বরের সমক্ষে যাইয়া বিপদ বার্ত্তা নিবেদন করিল।

তৎকালে সুলতান সুলেমান কররাণি বঙ্গের মস্‌নদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পাঠানগণের দুর্গতির সংবাদ পাইয়া অগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন; এবং ত্রিপুরা বিজয়ার্থ স্বীয় শ্যালক ও সেনানায়ক মমারক খাঁকে তিন সহস্র অশ্বারোহী ও দশ সহস্র পদাতিক সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন। চট্টগ্রামে মমারক খাঁএর সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে প্রথমতঃ ত্রিপুর সৈন্যগণ পরাস্ত ও পলায়ন পর হইয়াছিল। পরে নব-বল সঞ্চয় করিয়া বিপুল বিক্রমে পুনর্ব্বার পাঠান বাহিনীকে আক্রমণ করিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে আট মাস কাল যুদ্ধ করিয়াও পাঠান শক্তিকে পরাজিত করিতে না পারায়, মহারাজ বিজয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেনাপতিদিগকে সূতা কাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থ চরকা উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। তৎকালে অকর্ম্মণ্য সেনাপতিগণের নিমিত্ত এবম্বিধ অপমানজনক দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। সেনাপতিগণের এইরূপ দণ্ড বিধানের পর শ্রীহট্ট থানা হইতে সৈন্যাধ্যক্ষ কালা নাজিরকে আনাইয়া বিস্তর সৈন্যসহ চট্টগ্রামস্থ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক করিয়া পাঠাইলেন। এই সৈন্যাধ্যক্ষ প্রত্যুষে সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রবল পরাক্রমের সহিত সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন।রাজা কর্ত্তৃক অপমানিত সৈন্যাধ্যক্ষগণ তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর না হওয়ায়, একাকী দীর্ঘকাল যুদ্ধ হেতু ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া চারিদণ্ড বেলা থাকিতে কালা নাজির সমরানলে স্বীয় জীবন আহুতি প্রদান করিলেন।

পাঠানগণ যুদ্ধ জয় করিয়া বিজয়োল্লাসে গড়ে প্রবেশ করিল। শ্রান্ত সৈন্যদল রাত্রিকালে কেহ নিশ্চিন্ত মনে আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছে, কেহ ক্লান্ত হস্তী ও অশ্বকে জলপান করাইতেছে, কেহ বা আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এই সময় ত্রিপুর সৈন্যগণ অকস্মাৎ গড়ে প্রবিষ্ট হইয়া পাঠানদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা অপ্রস্তুত ছিল সুতরাং অধিকাংশ সৈন্য নিহত হইল, অল্প সংখ্যক পাঠান অতি কষ্টে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিল। সেনাপতি মমারক খাঁ ধৃত ও পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় রাজ দরবারে নীত হইবার পর, চন্তাইর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহাকে চতুর্দ্দশ দেবতা সমক্ষে বলিদান করা

হইয়াছিল।

মুসলমাণগণের বারম্বার আক্রমনের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত মহারাজ বিজয়, বঙ্গদেশ আক্রমণ কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময় পাঠান ও মোগলের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের ফলে পাঠানগণ বিশেষ বিব্রত ও অপেক্ষাত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সুলেমানের পুত্র দায়ুদ শাহ এই সময় বঙ্গের শাসন কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলন। মহারাজ বিজয়, পঞ্চ সহস্র রণতরী, পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী ছাব্বিশ সহস্র পদাতিক ও বহু সংখ্যক গোলন্দাজ সৈন্যসহ অভিযান করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই সুবর্ন গ্রামের মুসলমান শাসন কর্ত্তাকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া, সেই প্রদেশ লুন্ঠন করিলেন। তৎপর ক্রমান্বয়ে লক্ষ্যানদী অতিক্রম করিয়া পদ্মা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্যায় স্নানান্তে যে মুদ্রা প্রচার করেন, তাহা আলোচনায় জানা যাইতেছে, ইহা ১৪৮০ শকের ঘটনা। উক্ত মুদ্রায় যে সকল বাক্য উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

লাক্ষাস্নায়ি
শ্রীশ্রীত্রিপুর ম
হেশ বিজয় মাণি
ক্য দেব শ্রীলক্ষ্মী
বাল্যা দেব্যৌ

(উপরে)
মহিষমর্দ্দিণী মূর্ত্তি
(নিম্নে)
দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহ মূর্ত্তি
শক ১৪৮ X

শকাঙ্ক-১৪৮০ স্থলে ০ শূণ্যের পরিবর্ত্তে **X** চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা ত্রিপুরার অঙ্কপাতের বহু প্রচিন প্রথা।

এই অভিযান সম্বন্ধে জেমস্ রেভারেণ্ড লঙ্ সাহেব বলিয়াছেন;-

"At this time Bijoya Raja of Tripuramarched to Bengal with an army composed of 26000 infantry, and five thousand horses besides artillery ; he went by 5,000 boats along the streams Brahmaputra and Lakhi to the Padma."

Joumal Asiatic Society of Bengal, Vol. XIX

এই উক্তি দ্বারা জানা যাইতেছে, এ যাত্রায় মহারাজ বিজয় পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়াছিলেন। মোগল সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল তাঁহার

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখিয়াছেন-

"ভাটী প্রদেশের সহিত সংলগ্ন একটি স্বাধীন রাজ্য আছে, সেই রাজ্যের নাম তিপ্রা (ত্রিপুরা) আর তাঁহার অধিপতির নাম বিজয় মাণিক (মাণিক্য)। *** এই রাজার দুই লক্ষ পদাতি ও এক সহস্র হস্তী আছে, কিন্তু অশ্ব অতি বিরল।"
আবুল ফজল "অশ্ব অতি বিরল" বলিয়াছেন। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, বঙ্গাভিযানে মহারাজ বিজয়ের সঙ্গে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ছিল।ত্রিপুর বংশাবলীর মতে, বিজয় মাণিক্য দশ হাজার পাঠান দ্বারা অশ্বারোহী দল গঠন করিয়াছিলেন। সুতরাং অশ্ব অতি বিরল বলা যাইতে পারে না।

মহারাজ বিজয় ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিয়া বিবিধ দানের সহিত ব্রাহ্মণকে পঞ্চদ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, এতদুপলক্ষে মহেশ্বরদী পরগণার অর্ন্তগত একটি গ্রামের 'পঞ্চ-দ্রোণা' বা 'পাঁচ দ্রোণা' নাম হইয়াছে।
এই অভিযানে মহারাজ বিজয় ক্রমান্বয়ে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন।
এই অভিযান বর্ণনোপলক্ষে রাজমালা বলিয়াছেন,-

"লোহিত পশ্চিম ভাগে বসতি জাহ্নবী।
পূর্ব্ব ভাগে যমুনা যে সরস্বতী দেবী ॥"*
বিজয়মাণিক্য খণ্ড, -৫৫ পৃষ্ঠা।

উক্ত প্রদেশ সমূহ লুণ্ঠন করিয়া মহারাজ বিজয় বিস্তর অর্থ ও দ্রব্যজাত সংগ্রহ পূর্ব্বক, কৈলাগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ও তথা হইতে শ্রীহট্টে গমন করিয়াছিলেন। তিনি দেশ লুণ্ঠন করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, তৎসমস্ত হস্তগত রাখিবার নিমিত্ত শ্রীহট্ট, কলাকোপা নসিরাবাদ, বিশালগড়, মেহেরকুল, বিশগাঁও, সুসঙ্গ ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে সুরক্ষিত সেনানিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। এবার তাঁহার পক্ষে ঊনকোটী তীর্থ দর্শন ঘটিয়াছিল।

---

* লোহিত্য = ব্রহ্মপুত্র। জাহ্নবী = গঙ্গা। যমুনা = ব্রহ্মপুত্রের অংশ বিশেষ; ইহার পূর্ব্বতীরে ময়মনসিংহ ও পশ্চিম তীরে পাবনা জেলা। সরস্বতী = সুন্দর বনের সন্নিহিত ত্রিবেণীতে এই নদী প্রবাহিতা ছিল, এখন তাহার খাত বুজিয়া গিয়াছে।

শেষ জীবনে মহারাজ বিজয় কিয়ৎ পরিমানে দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি যে বৎসর মানবলীলা সম্বরণ করেন, সেই বৎসর ইয়ুরোপীয় ভ্রমনকারী রলফ্ ফিছ্ ত্রিপুরা রাজ্যের ভিতর দিয়া চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন, তিনি স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে বিবৃত করিয়াছেন, -

"From Satagan I travelled by the country of the King of Tippera, with whom the Mogen have almost continual wars. The Mogen which be of the kingdom of Recon and Rame, be stronger than the King of Tippera. So that Chatigan or Portogrando, is often times under the King of Recon."

প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ও মঘগণের সহিত বারম্বার আহবে লিপ্তহেতু মহারাজ বিজয় মাণিক্যকে বিশেষ বিব্রত হইতে হইয়াছিল।

বিজয়মাণিক্যের শৌর্য্য ও সৈনিকবলের যে আভাস পাওয়া যাইতেছে, তদ্দ্বারা তিনি যে বীরপুরুষ এবং যোদ্ধা ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তাঁহার শাসনকালে, পাঠানগণের দ্বারা অশ্বারোহী দল গঠিত হইবার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ত্রিপুরার সামরিক বিভাগ নব বলে বলীয়ান হইয়াছিল সত্য, কিন্তু পাঠাগণের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ, তাহাদিগকে সৈনিক বিভাগ হইতে বিতাড়িত করিতে হইয়াছিল।

খাড়াইত সৈন্য মহারাজ বিজয়ের আর এক নব গঠিত বল। উড়িষ্যা প্রদেশে পূর্ব্ব হইতেই খণ্ডায়েত বা খাড়াইত সৈন্য ছিল, ত্রিপুরায় মহারাজ বিজয় মাণিক্যই এই শ্রেনীর সৈনিকবল প্রথম স্থাপন করেন। বিশেষ সাহসী ও বলশালী ব্যক্তিদিগকে এই বিভাগে নিযুক্ত করা হইত। খাড়াইত সৈন্য সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত হইয়াছে, -

"সাতবার ধন্যসাগর ফিরিতে যে পারে।
সেই জনা তার নাম খারাতাইয়া ধরে ॥
দিবারাত্র থাকে রাজদ্বারেতে প্রহরী।
বড় বড় অঙ্গ তারার বিক্রমে কেশরী ॥"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

ধন্যসাগর দৈর্ঘ্যে ১০০০ গজ ও প্রস্থে ২৭০ গজ। যে ব্যক্তি বেগ গতিতে

সাতবার এই সাগর প্রদক্ষিণে সক্ষম হইত, তাহাকেই খাড়াইত বিভাগে বিয়োগের যোগ্য বলিয়া গণ্য করা হইত। খাড়াইত বা খড়গধারী সৈন্য নব উদ্ভাবিত নহে, অতি প্রাচীনকালেও সৈনিক বিভাগে এই শ্রেণীর লোক ছিল। পুরাণ গ্রন্থ আলোচনায় পাওয়া যায়, -

"সুরূপস্তরুণঃ প্রাংশু দৃঢ় ভক্তি কুলোচিতঃ।
শূরঃ ক্লেশসহশ্চৈব খড়গধারী প্রকীর্ত্তিতঃ ।।"

মৎস্য পুরাণ - ২১৫ অঃ, ১৮ শ্লোক।

সুন্দর দর্শন, তরুণক বয়স্ক, দীর্ঘকায়, রাজার প্রতি দৃঢ় অনুরক্ত, সৎকূল সম্ভূত, শূর এবং কষ্ট সহিষ্ণু ব্যক্তিকে খড়গধারী পদে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ত্রিপুরায় এই ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

মহারাজ বিজয় কেবল বীর ছিলেন না - ধার্ম্মিকও ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হীরা গোপীনাথ বিগ্রহ ও উক্ত বিগ্রহের গগনস্পর্শী প্রস্তরময় মন্দিরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরকে অনেকে 'ধনের কুঠি' বলে। মন্দিরটি বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারদেশস্থ চৌকাঠরূপে ব্যবহৃত ফলকটি এখনও অরণ্য মধ্যে পতিত অবস্থায় আছে। তাহাতে উৎকীর্ণ শকাঙ্ক আলোচনায় জানা যায়, মন্দিরটি ১৪৭০ শকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাহুল্য ভয়ে সুদীর্ঘ শিলালিপির পাঠ এস্থলে প্রদান করা হইল না।

এতদ্ব্যতীত ভূমি দান, তুলাপুরুষ দান ও কল্পতরু দান ইত্যাদি অনেক সৎকার্য্য মহারাজ বিজয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহার মহিষী পুণ্যবতী মহাদেবী হোমনাবাদে অনেক ভূমি দান ও তিষ্ণা পরগণায় জলাশয় খনন করিয়াছিলেন। মহারাজের অন্য মহিষীর নাম ছিল লক্ষ্মীবালা। তাঁহার নামানুসারে গ্রামের নাম 'লক্ষ্মীপুর' হইয়াছিল, উদয়মাণিক্যের মহিষী কর্ত্তৃক সেই নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া হীরাপুর নামকরণ হইয়াছে।

শিল্প কার্য্যের উন্নতি পক্ষে মহারাজ বিজয় বিশেষ উৎসাহশীল ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশ হইতে নানা শ্রেণীর শিল্পী আনিয়া রাজ্য মধ্যে স্থাপিত করিয়া শিল্পোন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

মহারাজের ডুঙ্গুর ও অনন্ত নামে দুইটি কুমার বিদ্যমান ছিলেন। তিনি ডঙ্গুরকে বহু ধন রত্ন দিয়া উড়িষ্যায় প্রেরণ করিলেন, এবং তাঁহাকে সযত্নে রক্ষা করিবার নিমিত্ত

উড়িষ্যাপতি মুকুন্দদেবকে পত্রদ্বারা অনুরোধ করিলেন। অনন্তদেবকে ভাবী রাজা স্থির করা হইল, কিন্তু তিনি নিতান্ত দুশ্চরিত্রান্বিত ছিলেন। রাজা বুঝিলেন উপযুক্তঅভিবাবকের তত্ত্বাবধানে না থাকিলে ইহার দ্বারা রাজ্য শাসিত হওয়া অসম্ভব হইবে। তাই তিনি সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন এবং গোপীপ্রসাদ শালগ্রাম চক্র ও হরিবংশ গ্রন্থ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন- তিনি কখনও জামাতার অহিতকর কার্য্যে লিপ্ত হইবেন না। পরিশেষে সেনাপতি, জামাতাকে নিহত ও সিংহাসন অধিকার করিয়া এই প্রতিজ্ঞার মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছিলেন। ইনিই উদয়পুর প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ উদয়মাণিক্য।

পুত্রকে সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিয়া, ১৪৯২ শকে (১৫৭০ খ্রীঃ) বসন্ত রোগে মহারাজ বিজয় অনন্তধামে গমন করিলেন। রাজমহিষীগণ পতির সহগামিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনে, ত্রিপুরা জননীর অঞ্চল হইতে যে উজ্জ্বল মাণিক্য খসিয়া পড়িয়াছিল, সেই ক্ষতি আর কোন কালেই পূর্ণ হয় নাই।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য

মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্য মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া মুরশিদাবাদে গমন করেন। তখন কৃষ্ণমণি ঠাকুর যুবরাজ ছিলেন। মহারাজ গমনকালে যুবরাজকে বলিয়া গেলেন,- রাজ্যে নানাবিধ উপদ্রব হওয়া অনিবার্য্য, তুমি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বকূল নামক কুকি প্রদেশে চলিয়া যাও। যুবরাজ রাজাজ্ঞানুসারে পূর্ব্বকুল গমন করিলেন। তাঁহার রাজধানী পরিত্যাগকালে যে সকল ব্যক্তি সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা এই,-

"ইন্দ্র মাণিক্যের রানী প্রবেশিলা বন।
যত পরিবার ছিল চলিল তখন ॥
ঠাকুর যে হরিমনি চলিলা পশ্চাৎ।
কৃপারাম ঠাকুর চলিলা সহসাত ॥
চলে ধন ংকুর ঠাকুর নারায়ণ।
বলভদ্র ঠাকুর চলিল ততক্ষণ ॥
হাড়িধন লস্কর আর সেবক নয়ন।
যুবরাজ সঙ্গে তারা করিল গমন ॥
বিজয় সিংহের সনে কতক থাকিয়া।
যুবরাজ সঙ্গে চলে অস্ত্রধারী হইয়া ॥"

কৃষ্ণমালা।

যুবরাজ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ পুর্ব্বকূলস্থ মনু নদীর তীরবর্ত্তী 'করবঙ্গ' সম্প্রদায়ের কুকি পল্লীতে গমন করেন। এইস্থানে সপরিবারে কিয়ৎকাল অবস্থান করিবার পর, পিঙ্চাঙ্ ও কলিরায় নামক জয় মাণিক্যের দুইজন অনুচর স্বীয় প্রভুর পক্ষাবলম্বী হইয়া, বহু সৈন্যসহ যুবরাজকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিল। মহারাজ ইন্দ্র, জয় মাণিক্যকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া রাজত্ব অধিকার করিয়াছিলেন, ইহাই জয় মাণিক্যের আক্রোশের কারণ। যুবরাজ কৃষ্ণমণি ঠাকুরের বাহুবল অসহনীয় হওয়ায়, আক্রমণকারী বহু সৈন্য কালক বলে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। বনবাসকালে ইহা যুবরাজের পক্ষে অশান্তির প্রথম সূচনা। এই ঘটনার পর যুবরাজ করবঙ্গ পাড়ায় বাস করায় বিপদসঙ্কুল মনে করিয়া কৈলাশহরে গমন করিলেন।

কালের প্রভাব এতই প্রবল যে, যুবরাজ কৈলাশহরেও অধিককাল শান্তিতে বাস করিতে পারিলেন না। নুরনগর পরগণার অর্ন্তগত দেবগ্রাম নিবাসী পাঁচকড়ি শুঁড়ি নামক এক ব্যক্তিমনে করিল, এই সময় নিঃসহায় যুবরাজকে ধৃত করিয়া দিতে পারিলে মুসলমান শাসনকর্তার কৃপা লাভ করা সহজ হইবে। সে ঢাকা নগরীতে যাইয়া, ত্রিপুরার নব বিজেতা হাজী হোসেনকে জানাইল,- "যুবরাজ কৈলাশহরে অবস্থান করিয়া তদঞ্চল শাসন করিতেছেন। তাঁহাকে সেই স্থান হইতে ধৃত করিয়া না আনিলে রাজ্যের উত্তরাংশে মোগল শাসন স্থাপন করা অসম্ভব হইবে। আদেশ পাইলে আমি কৈলাশহর ঘাটে দখল সংস্থাপন করিতে এবং যুবরাজকে ধৃত করিয়া আনিতে পারি।" হাজী হোসেন পাঁচকড়ির বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া, কৈলাশহর ঘাটে শাসন ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ এবং যুদ্ধার্থ বহু সৈন্য প্রদান করিলেন। পাঁচ কড়ি সসৈন্য আগমন করিতেছে শুনিয়া, যুবরাজ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। সময়ের দোষে স্বীয় অধিকারস্থ সামান্য প্রজাও বিপক্ষাতাচরণে সাহসী হইতেছে, ইহা ভাবিয়া তাঁহার বিস্ময়ের ও মনোকষ্টের সীমা রহিল না। পাঁচকড়ি কৈলাশহর ঘাটে যাইয়া শিবির স্থাপন করিল। তাঁহার আক্রমণের পূর্ব্বেই যুবরাজ পরিবার বর্গ ধর্ম্মনগরে প্রেরণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, এবং প্রতিপক্ষকে আক্রমণের অবসর না দিয়া রজনীযোগে তাঁহার সৈন্যদল শত্রু শিবির আক্রমণ করিল। পরদিন অনেক বেলা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল, কিন্তু কোন পক্ষই জয়লাভে সমর্থ হইল না। যুবরাজ ভাবিলেন, মোগল বাহিনীর সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করা সহজসাধ্য নহে। তিনি যুদ্ধ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ ধর্ম্মনগরে এবং তথা হইতে পরিবারবর্গ সহ পাথারিয়ায় গমণ করিলেন। পাথারিয়ার তদানীন্তন জমিদার মাহামুদ নাছির, যুবরাজকে সাদরে গ্রহণ ও সেই স্থানে অবস্থান জন্য সর্নিবন্ধ অনুরোধ করায়, তাঁহার যত্নাতিশয্যে যুবরাজ কিয়ৎকাল সেই স্থানে বাস করিয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল পাথারিয়ায় অবস্থারের পর, যুবরা পরিবারবর্গসহ হেড়ম্ব রাজ্যে (কাছারে) গমন করিলেন। এই সময় মহারাজ রামচন্দ্রধ্বজ হেড়ম্বেশ্বরের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি যুবরাজ কৃষ্ণমণিকে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং তাঁহার বাসের নিমিত্ত এক সুরম্য আবাস প্রদান করিলেন। এই সময় যুবরাজের ভাগিনেয়ী (গৌরীপ্রসাদ কবরার দুহিতা) সুরধনীকে (নামান্তর সঙ্গমা) মহারাজ রামচন্দ্রধ্বজের সহিত বিবাহ দিয়া উভয়ের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপন করা হইয়াছিল।

এইস্থানে যুবরাজ কৃষ্ণমণি তিন বৎসরকাল সসম্মানে অবস্থান করেন। কিন্তু তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। রাজ্যেশ্বর ইন্দ্র মাণিক্য রাজ্য ভ্রষ্ট এবং দেশান্তরিত,

পরিবারবর্গসহ নিজে বিপন্নবস্থায় পরের আশ্রিত, এই সকল অশান্তির বৃশ্চিক দংশনে তাঁহাকে সর্ব্বদা অধীর করিতেছিল। তিনি রাজ্যোদ্ধারের চিন্তায় অষ্ট প্রহর নিমগ্ন থাকিতেন। ইতিমধ্যে মুরশিদাবাদে, মহারাজ ইন্দ্র মাণিক্যের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিল। এই দুর্ব্বিসহ শোচনীয় ঘটনায় যুবরাজ অধিকতর অধীর হইয়া পড়িলেন, পরিবারস্থ সকলেই শোক-বিহ্বল, অহর্নিশি ক্রন্দনের রোলে যুবরাজের আলয় ঘোর অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া সকলেই আশা করিতেছিলেন, মহারাজ ইন্দ্র মুরশিদাবাদ দরবার হইতে পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তিত হইবেন। এই আশায় বুক বাধিঁয়াই তাহারা দুর্ব্বিসহ বিপদেও কথঞ্চিত ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেছিলেন। রাজার পরলোক গমনের সংবাদে তাঁহাদের সকল আশাই নির্ম্মূল হইল। এই সময় মহারাজ রামচন্দ্রধ্বজ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া শোকসন্তপ্ত পরিবারকে প্রাবোধ দান করিতেছিলেন।

যুবরাজ হেরম্ব রাজ্যে বাস করিতেছেন, পূর্ব্বকুলবাসী কুকিগণের ইহা মনঃপুত হইল না। তাহাদের রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিন্ন রাজার আশ্রয়ে বাস করিতেছেন, তাহারা ইহা নিজেদের কলঙ্ক বলিয়া মনে করিল। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া নানাবিধ ভেট দ্রব্যসহ হেড়ম্বে যাইয়া যুবরাজকে জানাইল, "আমাদের পুরুষানুক্রমিক রাজা ভিন্ন রাজ্যে বাস করিবেন, ইহা কিছুতেই শোভনীয় হইতে পারে না, আপনি সপরিবারে পূর্ব্বকুলে চলুন, আমরা সকলে মিলিয়া প্রাণপণে আপনার সেবা করিব।"

যুবরাজ রাজানুরক্ত প্রজাবৃন্দের ভক্তিভাবাশ্রিত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না; বিশেষতঃ তিনি বুঝিলেন, হেড়ম্বে থাকিয়া রাজ্যোদ্ধারের উপায় করিবার সম্ভাবনা নাই। অনেক চিন্তার পর তিনি পূর্ব্বকূলে যাইয়া কুকিপুঞ্জিতে বাস করাই শ্রেয় মনে করিলেন। হেড়ম্বেশ্বর রামচন্দ্রধ্বজ যুবরাজের এই সঙ্কল্পে দুঃখিত হইলেন, কিন্তু বাধা দেওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না। কুকিবাহিনী যুবরাজকে লইয়া হৃষ্টচিত্তে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। হেড়ম্বপতি বিস্তর সৈন্য সঙ্গে দিয়া যুবরাজকে সাদরে বিদায় করিলেন।

ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অর্ন্তগত দক্ষিণশিক পরগণা নিবাসী সামসের গাজি নামক জনৈক সামান্য প্রজাই ত্রিপুরার এই রাষ্ট্রবিপ্লবের মূলীভূত কারণ। তাঁহার প্ররোচনায় পূর্বোক্তহাজী হোসেন বঙ্গেশ্বরের অনুমতি ও সাহায্য গ্রহণ করিয়া, ত্রিপুরা জয় করিয়াছিলেন। হাজী হোসেন ঢাকায় অবস্থান করিতেন, এই সুযোগে সামসের গাজী হাজী হোসেনের অধীনে ত্রিপুরার শাসন ভার লাভ করেন। তিনি রাজধানী

উদয়পুর পর্য্যন্ত হস্তগত ও সমগ্র রাজ্য অধিকার বিস্তার করিয়া বসিলেন। উদয়পুরস্থ প্রধান ব্যক্তিগণ ও প্রজাবর্গ রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে-ভেলার হাকর ও মনতলা হাকরে যাইয়া বাস করিতেছিল। সমসের গাজীর পক্ষাবলম্বী, ত্রিপুরেশ্বরের উজীর রামধন প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক নিহত হইবার পর, সমসেরের আক্রমনের ভয়ে তাঁহারা আর সেই স্থানে অবস্থান করা নিরাপদ মনে করিল না। সকলে পরামর্শ করিয়া রাজ্যের দক্ষিণপ্রান্তবর্ত্তী রিয়াং দেশে চলিয়া গেল। এই সময় মায়োনী নদীর তীরে রিয়াং পল্লী অবস্থিত ছিল, এবং প্রবল পরাক্রান্ত ও বিচক্ষণ বোদ্ধা চণ্ডী প্রসাদ নারায়ণ রায় (প্রধান সরদার) ছিলেন। তাঁহার সহিত একত্রে বাস ও তাঁহার পরামর্শ গ্রহণে কার্য্য করা সকলেই কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিল। ত্রিপুর সেনাপতি দুষ্ট বুদ্ধি রণমর্দ্দন নারায়ণ যুবরাজ কৃষ্ণমণির প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি সকলের সঙ্গে রিয়াং দেশে যাইতে সম্মত হইলেন না।

যুবরাজ পূর্ব্বকূলে আসিয়া সংবাদ পাইলেন, সমস্ত প্রজা রিয়াং দেশে মিলিত হইয়াছে এবং তাঁহারা সকলেই যুবরাজের হিতকামী। তখন তিনি তাহাদিগকে পত্রদ্বারা জানাইলেন -"আমি রাজ্য ভ্রষ্ট এবং বনবাসী হইয়াছি। রাজা পরলোকে; কালের কুটিল চক্রে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। এখন নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে কোন কালেই এই বিপদ হইতে নিস্তার লাভ ঘটিবে না। তোমরা রাজ্যেদ্ধারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হও।" যুবরাজের পত্র পাইয়া সকলে মিলিয়া পরামর্শ পূর্ব্বক প্রত্যুত্তরে জানাইল - 'আপনি কৃপা পরবশ হইয়া এই স্থানে শুভাগমন করিলে, আপনার আদেশানুসারে আমরা সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।' অতঃপর যুবরাজ পরিবারবর্গসহ হরিমণি ঠাকুরকে পূর্ব্বকূলে রাখিয়া, অন্যান্য অনুচরবর্গ লইয়া রিয়াং দেশে গমন করিলেন এবং মায়োনী নদীর তীরে আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময় সামসের গাজীর প্রধান অনুচর আবদুল রেজাকের সহিত তাঁহার বিরোধ হওয়ায়, আবদুল রেজাক সামসের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, ভোজপুর গ্রামে যাইয়া বাস করিতেছিল। সে আসিয়া যুবরাজ কৃষ্ণমণির পক্ষ অবলম্বন করিল। এই মিলনে যুবরাজ আনন্দিত হইলেন। কিন্তু রাজপুরোহিত ধর্ম্মরত্ন নারায়ণ যুবরাজকে সর্তক করিয়া বলিলেন - 'দস্যুর অনুচর দস্যুকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে, সে নিশ্চয়ই কার্যকালে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে।' কার্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। সমসের গাজী এই বার্ত্তা পাইয়া বিশেষ চিন্তিত এবং আবদুল রেজাককে বশীভূত করিবার নিমিত্ত চেষ্টিত হইলেন। সমসেরের প্ররোচনায় আবদুল রেজাক অল্পকাল মধ্যেই যুবরাজের পক্ষ

পরিত্যাগ করিয়া সমসেরের সহিত পুনঃ মিলিত হইয়াছিল। এই ঘটনায় যুবরাজের কোন প্রকার অনিষ্ট না হইয়া থাকিলেও আবদুল রেজাকের ব্যবহারে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকথিত সেনাপতি রণমর্দ্দন নারায়ণও এই সময় যুবরাজকে পরিত্যাগ করিয়া সমসেরের পক্ষাবলম্বী হইলেন।

আবদুল রেজাককে এবং যুবরাজের গৃহশত্রু রণমর্দ্দণকে সহায় পাইয়া সমসের প্রবল উৎসাহে রিয়াং প্রদেশে যুবরাজকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি পূর্ব হইতেই সর্তক ছিলেন। সমসেরের সেনাদল আসিতেছে শুনিয়া তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া পথিমধ্যে সমসেরকে আক্রমণ করিল। দীর্ঘকাল ব্যাপী তুমুল সংগ্রামের পর, সমসের পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলেন। ত্রিপুর সেনাপতি বাঠিরায় মায়োনী নদীর ভাটীতে সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বক শত্রু পক্ষ আগমণের প্রতীক্ষায় ছিলেন, সমসেরের সৈন্যদল তথায় উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এক দিবস ব্যাপী যুদ্ধের পর বাঠীরায় পরাজিত হইয়া, রিয়াং প্রদেশে যুবরাজ সন্নিধানে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উজীর উত্তর সিংহ নারায়ণ যুবরাজকে ছাড়িয়া কতগুলি সৈন্য ত্রিপুর প্রজা লইয়া মনতলা হাকরে প্রস্থান করিলেন। যুবরাজ দেখিলেন, আত্মপক্ষের চিত্তশুদ্ধি নাই, অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইয়া ফল লাভের আশা অতি বিরল। বিশেষতঃ এই স্থান সর্ব্বদাই শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং তিনি রিয়াং দেশ পরিত্যাগ করিয়া সৈন্য সামন্ত সহ পুনর্ব্বার লঙ্গাই নদীর তীরবর্ত্তী বঙ্গপাড়ায় চলিয়া গেলেন। যুবরাজের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই সমসের গাজী রিয়াং দেশে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া, আবদুল রেজাক ও রণমর্দ্দন নারায়ণের হস্তে তথাকার ভার অর্পণ পূর্ব্বক নিজ বাস ভবনে চলিয়া গেলেন।

যুবরাজ বঙ্গপাড়া হইতে সমসের গাজীর বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেনাপতি জয়দেবকে এই অভিযানের প্রধান নায়কত্ব প্রদান করা হয়। তিনি রিয়াং দেশ আক্রমণ করিয়া সমসেরের বিস্তর সৈন্য নিহত করিয়াছিলেন। আবদুল রেজাক ও রণমর্দ্দন নিরুপায় হইয়া পলায়ন করিল।

যুদ্ধ জয়ের সংবাদ পাইয়া যুবরাজ আনন্দিত হইলেন। এই সময় তিনি বঙ্গপাড়া ছাড়িয়া পূর্ব্বকূলে গমন করিয়াছিলেন। এখানে আসিয়াও তিনি বিপদ মুক্ত

পীঠদেবী ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী (উদয়পুর)

হইতে পারিলেন না। পূর্ব্বকূলের সান্নিধ্যবাসী খু চুং ও লুচি (লুসাই) সম্প্রদায়ের কুকিগণ ত্রিপুরার শাসন অস্বীকার করিয়া, সময় সময় পূর্ব্বকূল প্রদেশ আক্রমণ, লুন্ঠন ও নরহত্যা দ্বারা ঘোর অশান্তি জন্মাইতে ছিল। যুবরাজ এই অবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া সপরিবারে হেড়ম্ব রাজ্যের অন্তবর্ত্তী হালিয়াকান্দি গ্রামে গমন করিলেন। তৎকালে হেড়ম্বাধিপতি রামচন্দ্রধ্বজ পরলোক গমন করায়, তাঁহার অল্প বয়স্ক পুত্র হরিশচন্দ্রধ্বজ রাজত্ব লাভ করিয়াছেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি তাঁহাকে পত্রদ্বারা জানাইলেন, - 'আপনার দেশে পরিবারদিগকে রাখিয়া, আমি পূর্ব্বকূল প্রদেশে শান্তি স্থাপনোদ্দেশ্যে যাইতেছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহাঁদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।' এই পত্র প্রেরণ করিয়া, যুবরাজ অনুচরবর্গ ও সৈন্যসহ পূর্ব্বকূলে পুনরাগমন করিলেন। তাঁহারা রাংঙ্খল সম্প্রদায়ের পুঞ্জীতে যাইয়া ছাউনী করিয়াছিলেন।

এখান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুবরাজ বিদ্রোহী খুচুংদিগের বিরুদ্ধে সমরসিংহ নারায়ণকে প্রেরণ করিলেন। অধিকাংশ সৈন্য খুচং অভিযানে পাঠাইয়া, অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ যুবরাজ শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। খুচুং কুকিগণ বুঝিল, যুবরাজের শিবির আক্রমণ করিবার ইহাই উত্তম সুযোগ। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া, রাঙ্খল পাড়ার দিকে ধাবিত হইল। খুচুংগণের রণসজ্জা সম্বন্ধে কৃষ্ণমালা গ্রন্থে লিখিত আছে;

"কটিতে বসন নাই দিগম্বর বেশ।
সকল মস্তক যুড়ি আছে মুক্ত কেশ॥
গবয়ের চর্ম্ম নির্ম্মিত দীর্ঘ ঢাল।
পৃষ্ঠে দোলে, করেতে কুকিয়া তরয়াল॥
লোহার টোপর মাথে রাঙ্গাবস্ত্র গায়।
তীক্ষ্ণধার শেল হাতে রণে আগুয়ায়॥
তীর কোষে ভরা আছে বিষে মাখা তীর।
হাতে দিব্য ধনু রণে নির্ভয় শরীর॥
খুচুঙ্গ কুকির এই কহিল লক্ষ্মণ।
এই মতে করি সাজ তারা করে রণ॥"

খুচুংগণ রজনীযোগে গুপ্তভাবে আসিয়া, শেষ রাত্রিতে রাঙ্খল পল্লী আক্রমণ করিল। পল্লীতে প্রবেশের পথরক্ষক ত্রিপুর সৈন্যগণ সতর্ক ছিল, প্রথম আক্রমণেই তাহারা বিপক্ষকে প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিল। কুকিগণের

বিষলিপ্ত তীরের আঘাতে ত্রিপুর সৈন্য অধীর হইয়া পড়িল। তাহারা পশ্চাৎপদ হইলে, কুকিগণ নিদ্রিত পল্লীতে অতর্কিতভাবে প্রবেশ করিয়া, নরহত্যা ও লুন্ঠন কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। খুচুংগণের উল্লাস ধ্বনি ও পুঞ্জবাসীদিগের আর্ত্তনাদে যুবরাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ব্যস্তভাবে গাত্রোত্থান করিয়া ভ্রাতা হরিমণিকে সহ যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন।

রাত্রি প্রভাতের পরেও অনেক বেলা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতেছিল, ত্রিপুর সেনানীগণ মধ্যে যাঁহারা অন্যান্য পল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা অবিলম্বে দলবল সহ আসিয়া যুদ্ধে যোগদান করিলেন। দুর্ব্বার কুকিগণ পরাজিত এবং পলায়নপর হইয়াও বারম্বার আসিয়া আক্রমণ করিতে লাগিল। তাহাদের অনেকে নিহত হইল, অবশিষ্ট কুকি সম্পূর্ণরূপে নির্য্যাতিত হইয়া পলায়ন করিল।

যুদ্ধ জয়ের পরে সকলে যুবরাজ সদনে আসিয়া দেখিল, তাঁহার পাদমূলে একটি বিষ-দিগ্ধ তীর বিদ্ধ হইয়াছে। এই দুর্ঘটনা দর্শনে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া বিশেষ সর্তকতার সহিত তীর উন্মোচন করিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই যুবরাজের শরীরে বিষক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি অনতি বিলম্বে চেতনা শূন্য হইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিষের জ্বালায় বিবর্ণ হইয়া গেল, দেহের উষ্ণতা তিরোহিত হইল। যুবরাজের জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া সকলেই শোকে অধীর হইয়া উঠিল।

এই অবস্থা দর্শন করিয়া জনৈক বৃদ্ধ কুকি নানাবিধ বিষঘ্ন বনৌষধি প্রয়োগ দ্বারা যুবরাজের চিকিৎসা আরম্ভ করিল। তৃতীয় প্রহর বেলা পর্য্যন্ত ঔষধের কোনরূপ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইল না; যুবরাজ জীবিত কি মৃত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই অবস্থা দর্শনে সকলেরই চিত্ত অত্যধিক ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

দেবী ভবানীর অপার কৃপায় বেলা তৃতীয় প্রহরের পর যুবরাজ ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, তখন সকলেই আশ্বস্ত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। যুবরাজ অব্যর্থ ঔষধির গুণে এবং শুশ্রূষার ফলে উত্তরোত্তর সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর যুবরাজ দেখিলেন, রাঙ্খল পল্লীর প্রজা অনেক নিহত হইয়াছে; যাহারা জীবিত আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আহত এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগকে লইয়া সেইস্থানে বাস করা অসঙ্গত মনে করিয়া, তিনি প্রজাবর্গ সহ রাঙ্খল পল্লী পরিত্যাগ করিলেন, এবং ছাকাছেপ পুঞ্জীতে যাইয়া সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক খুচুং

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। গোবর্দ্ধন কবরার সৈনাপত্যে বারম্বার বহু যুদ্ধের পর খুচুংগণ বৈশ্যতা স্বীকার ও কর প্রদান করিয়াছিল।

খুচুং প্রজাদিগকে সম্পূর্নরূপে দমন করিয়া সেনাপতি গোবর্দ্ধন কবরা, লুচি সম্প্রদায়ের (লুসাই) বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। সেকালে লুসাই সরদারের অধীনে সত্তর হাজার কুকি সৈন্য ছিল, সেনাপতি গোবর্দ্ধনের সৈন্য সংখ্যা নয় হাজারের অধিক নহে। তিনি সাহসে ভর করিয়া, এই অল্প সংখ্যক সেনাবল লইয়াই অগ্রসর হইলেন। গোবর্দ্ধন পথিমধ্যে নানাস্থানে লুসাইগণ কর্ত্তৃক বারম্বার আক্রান্ত ও বিজিত হইয়া বহু আয়াসে শত্রু আবাসের সম্মুখীন হইতে ছিলেন। কিছুদিন এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর, কবরা গোবর্দ্ধন, লুসাই সরদারের পল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ তুমুল সংগ্রামের পর, বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কনায়িনী হইলে, লুসাইগণ বশ্যতা স্বীকার করিয়া, কুকি সরদারের নিয়মিত কর স্বরূপ রাজ-ভেট প্রদান করিল। অতঃপর অন্যান্য কুকি সম্প্রদায়কে বশীভূত ও সমগ্র কুকি প্রদেশে ত্রিপুরার আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক সেনাপতি গোবর্দ্ধন বিজয়-শ্রী-ভূষিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে যুবরাজ কৃষ্ণমণি হালিয়াকান্দি হইতে পরিবারবর্গ আনিয়া পূর্ব্বকূলস্থ ছাকাছেপ্ পাড়ায় কিয়ৎকাল অবস্থানের পর, হেড়ম্ব রাজ্যের অন্তবর্ত্তী সানাই দেওয়ান পাথর নামক বিস্তীর্ণ চত্তরের সন্নিহিত পর্ব্বতের শীর্ষদেশে বাসস্থান নির্ব্বাচন করিলেন। তদঞ্চলের প্রজাবর্গ সকলেই রাজসন্নিধানে বাসের ইচ্ছুক হইয়া, যুবরাজের অনুমতিক্রমে সেই স্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছিল। অল্পকাল মধ্যে স্থানটি এক বৃহৎ নগরে পরিণত হইল। এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইলেও হেড়ম্ব রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী ছিল। পতিত অবস্থায় থাকায়, হেড়ম্বরের প্রজাগণ নানাভাবে এই স্থান ব্যবহার করিত; যুবরাজের আগমণের পর হইতে তাহাদের সেই সুবিধায় ব্যাঘাৎ ঘটিল। এই সূত্রে মন্ত্রীবর্গ অল্প বয়স্ক হেড়ম্বশ্বরকে বুঝাইলেন, যুবরাজ এই স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকিলে, স্থানটি চিরকালের নিমিত্ত হস্তচ্যুত হইবে। সুতরাং শীঘ্র তাঁহাকে এইস্থান হইতে বিতাড়িত করা একান্ত কর্ত্তব্য। অনেকস্থলে অল্প বয়স্ক নবীন ভূপতির প্রতি পুরাতন কর্ম্মচারিদিগকে অসঙ্গত প্রভাব বিস্তার করিতে দেখা যায়; হেড়ম্বের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। রাজা মন্ত্রীবর্গের পরামর্শে, যুবরাজ কৃষ্ণমণিকে বিতাড়িত করিতে উদ্যত হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই যুবরাজ, হেড়ম্ব রাজ কর্ত্তৃক অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই সময় ত্রিপুর সৈন্যগণ কাছে ছিল না। যে অল্প সংখ্যক শরীর রক্ষক সৈন্য ছিল, তাহারা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া সংখ্যাল্পতাবশতঃ পরাজিত হইল।

যুবরাজ নিরুপায় হইয়া প্রজাবর্গসহ রাঙ্খল পাড়াভিমুখে পলায়ন করিলেন। হেড়ম্বের সৈন্যগণ জনশূন্যনগর লুন্ঠন করিয়া রাজভবনের দ্রব্যজাত এবং প্রজাগণের যথা সর্বস্ব লইয়া চলিয়া গেল। যুবরাজ অদৃষ্টকে ধিক্কার করিয়া ক্ষুণ্ন মনে রাঙ্খল পাড়া হইতে ছাইমের পাড়াতে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে সমসের গাজীর উৎপীড়নে দেশময় এক ঘোর অশান্তির স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। পার্ব্বত্য প্রজাগণকে ভয় প্রদর্শন দ্বারা বশীভূত করিবার উদ্দেশ্যে সমসের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎপীড়নের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রজাগণও উত্তরোত্তর অধিকতর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে লাগিল। তাহারা অতিষ্ঠ হইয়া আবাস স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানাস্থানে যাইয়া অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও সমসেরের বশ্যতা স্বীকার করিল না।

সমসের গাজীর অত্যাচারের কথা ক্রমশঃ বঙ্গেশ্বরের কর্ণগোচর হইল। তাঁহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত নবাবের নিয়োজিত সৈন্যদল দক্ষিণদিকে উপস্থিত হইয়া, বহু চেষ্টায় সমসেরকে অবরুদ্ধাবস্থায় মুরশিদাবাদে লইয়া গেল। তথায় কিয়ৎকাল কারারুদ্ধ অবস্থায় রাখিবার পর, ইহার নানাবিধ দুর্বৃত্ততার বিষয় প্রমাণিত হওয়ায়, তাঁহাকে তোপের মুখে রাখিয়া নিহত করা হইয়াছিল।

সমসেরের এবম্বিধ শোচনীয় মৃত্যুর পরেও রাজ্য নিষ্কন্টক হইল না। তাঁহার প্রবল পরাক্রান্ত অনুচর আবদুল রেজাক মস্তকোত্তলন করিল। সমসেরের জীবিতকালে রোশনাবাদের শাসনভার আবদুল রেজাকের হস্তে ছিল, এখন সে উক্ত প্রদেশ স্বয়ং অধিকার করিয়া বসিল। যুবরাজ কৃষ্ণমণি বহু আয়াস স্বীকার করিয়া এবং শ্রীহট্টের তদানীন্তন আলিমের সাহায্য গ্রহণে আবদুল রেজাক বারম্বার পরাজিত ও বিতাড়িত করা সত্ত্বেও সে পশ্চাদপদ হইতে ছিল না। কিছুকাল নীরবে থাকিয়া, শক্তি সঞ্চয় করিয়া আবার অকস্মাৎ আসিয়া ত্রিপুর সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতেছিল। এইভাবে সুদীর্ঘকাল অতীত হইল।

অনবরত সংঘর্ষের ফলে আবদুল রেজাক কথঞ্চিৎ দুর্ব্বল হওয়ায়, যুবরাজ কৃষ্ণমণি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইলেন। হেড়ম্বেশ্বরের অযথা অত্যাচারের কথা তিনি বিস্মৃত হন নাই। এই সময় বোন্দাশীল গ্রামস্থ দরগার অধ্যক্ষ কর্ব্বল আলী শাহ নামক জনৈক ফকির যুবরাজ সমক্ষে পূর্ব্বকূলে উপস্থিত হইয়া জানাইলেন, "হেড়ম্বপতির

দুর্ব্ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া, তাঁহাকে উপযুক্ত ফল প্রদানের আশায় আপনার নিকট উপস্থিত-হইয়াছি। আমাকে সৈন্য সাহায্য প্রদান করিলে, হেড়ম্ব রাজ্য বিজয়ার্থ যাত্রা করিতে প্রস্তুত আছি।" ফকিরের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া যুবরাজ, সেনাপতি বলভদ্র কবরা ও কার্য্যপ্রসাদ নারায়ণকে বিস্তর সৈনিকবল সহ ফকিরের সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। ত্রিপুর বাহিনী ফকিরের প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ হেড়ম্বেশ্বরের হালিয়াকান্দি, তেলাইন ও লালসিংগড় হস্তগত করিয়া রাজধানী খাসপুরে উপনীত হইলেন। হেড়ম্বেশ্বর হরিশচন্দ্রধ্বজ রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। ত্রিপুর বাহিনী বিনা যুদ্ধে রাজপুরী অধিকার করিয়া তথায় শিবির স্থাপন এবং নগর লুণ্ঠন দ্বারা বিস্তর ধনরত্ন ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহ করিল।

এমন একটি সমৃদ্ধ রাজ্য হাতে পাইয়া, তাহা পরিত্যাগ করা ত্রিপুর সেনাপতিগণের অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু যুবরাজ কৃষ্ণমণির উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। হেড়ম্বেশ্বরকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কৃত অন্যায় কার্য্যের উপযুক্ত ফল প্রদান করা হইয়াছে, এখন যুবরাজ সেনাপতিদিগকে বিজিত রাজ্য ছাড়িয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। সেনাপতিগণ যুবরাজের আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু এমন একটা রাজ্য জয় করিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিতে দুঃখ হইতেছিল। এই অবস্থায় তাঁহাদের হেড়ম্ব ত্যাগ করিতে তিন মাস অতিবাহিত হইল।

এদিকে রাজ্যচ্যুত হেড়ম্বেশ্বর জয়ন্তিয়া রাজের শরণাপন্ন হইলেন। এবং তাঁহার সাহায্য গ্রহণে ত্রিপুর সেনাপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমে প্রবৃত্ত হইলেন। জয়ন্তিয়ার সেনানায়ক ত্রিপুর সেনাপতিকে জানাইলেন, ত্রিপুর সৈন্য বিজিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তাহাদের লুণ্ঠিত বস্তু সমূহ লইয়া যাইতে আপত্তি বা তাহাদের গমন পক্ষে কোনরূপ বাধা প্রদান করা হইবে না। ত্রিপুর সেনানী এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, হেড়ম্ব রাজ্য হইতে নিশ্চিন্ত মনে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে নদী পার হইবার কালে জয়ন্তিয়ার সৈন্যগণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অর্তকিতভাবে ত্রিপুর বাহিনীকে নদীর উভয় কুল হইতে আক্রমণ ও সমূলে বিনাশ করিল।

অতঃপর যুবরাজ কৃষ্ণমণি, পরিবারবর্গ সহ হরিমণি ঠাকুরকে মনু নদী তীরে রাখিয়া বটতলীতে গেলেন, এবং তথা হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেনাপতি লুচিদর্প নারায়ণকে কৈলাগড়ে (কসবায়) প্রেরণ করিয়া স্বয়ং মনতলায় গমন করিলেন। তিনি ১৬৮১ শকের বৈশাখ মাসে মনতলায় গিয়াছিলেন।

এই সময় আবদুল রেজাকের পুত্র সোণাউল্লা মেহেরকুলে (কুমিল্লায়) অবস্থান করিতেছিল। লুচিদর্প নারায়ণ ও হরনাথ হাজারি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া সে পলায়ন করে এবং মেহেরকুলে ত্রিপুরার সেনানিবাস স্থাপিত হয়। অতঃপর রেজাক দক্ষিণ শিকের প্রজাগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করায়, লুচিদর্প নারায়ণ যাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। আবদুল রেজাক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, পরিবারবর্গসহ অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিল। দক্ষিণশিকে ত্রিপুরার শিবির সন্নিবেশিত হইল। অতঃপর আবদুল রেজাককে মুরশিদাবাদে নিয়া, সমসরের ন্যায় নিহত করা হইয়াছিল।

এখন যুবরাজ নিজকে নিরাপদ মনে করিয়া, ভাগ্যবন্ত ও হারিধন ঠাকুরকে রাজত্ব-সনন্দের নিমিত্ত মুরশিদাবাদে প্রেরণ করিলেন। তদনুসারে বঙ্গেশ্বরের প্রদত্ত খেলাত ও সনন্দসহ ফৌজদার মীর আজিজ মেহেরকুলে আগমন করেন; ইহা ১১৬৯ত্রিপুরাব্দের কথা। এই সংবাদ পাইয়া যুবরাজ মনতলা হইতে কৈলারগড়ে যাইয়া উপরকিল্লায় বাসস্থান নির্ব্বাচন করিলেন। মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যের শাসনকালে যে ব্যক্তি যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, যুবরাজ তাঁহাদিগকে সেই সেই কার্য্যে নিয়োগ করিয়া রাজ কার্য পরিচালনের বিহিত ব্যবস্থা করিলেন। ফৌজদার মীর আজিজ মৃজাপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। জমিদারী বিভাগের নবাব সরকারী প্রাপ্য রাজস্ব তাঁহার হস্তে প্রদান করা হইত।

যুবরাজ কৃষ্ণমণির বিপদ একদিকে প্রশমিত হইলেও অন্যদিকে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিতেছিল। সমসের গাজী ও আবদুল রেজাকের পতনের পর আরেক নুতন বিপদ উপস্থিত হইল। ফৌজদার মীর আজিজ রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত আসিয়া, রোশনাবাদ জমিদারী হস্তগত করিবার নিমিত্ত প্রয়াসী হইলেন। তিনি কুমিল্লা হইতে যুবরাজকে পত্র লিখিলেন,- 'মেহেরকুল পরগণা জরিপ করা আবশ্যক, এই সময় আপনার পক্ষে জয়দেব ঠাকুর ও আমাদের পক্ষে রামবল্লভ দেওয়ান মিলিতভাবে কার্য্য করিলে ভাল হয়।' মহারাজ সরল বিশ্বাসে উজীরকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে বন্দী করাই ফৌজদারের উদ্দেশ্য ছিল, জয়দেবের সর্তকতার দরুণ সে বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। অতঃপর ফৌজদার যুদ্ধাকাঙ্খায়, অর্থ দ্বারা চট্টগ্রাম হইতে কতক যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়া, ত্রিপুরার দক্ষিণশিক গড় আক্রমণ করিলেন। সেনাপতি লুচিদর্প নারায়ণের বীরত্বের নিকট পরাজিত হইয়া, ফৌজদারকে এ যাত্রায় পশ্চাৎপদ হইতে হইয়াছিল।

ইহার পর ফৌজদার মীর আজিজ, স্বীয় পুত্র মীর ইছব ও দেওয়ান রামবল্লভকে সহ, বহু সৈন্য এবং বিস্তর যুদ্ধ সরঞ্জাম লইয়া জয়দেবকে 'ফুহারা' গড়ে আক্রমণ করিল। দুই দলে বহুক্ষণ যুদ্ধ হইবার পর ফৌজদারের পুত্র মীর ইছব ও সেনাপতি জীয়ন খাঁ যুদ্ধ ক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন করিল দেখিয়া ফৌজদারের সৈন্যগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হৃদয়ে পলায়ন করিল। মীর আজিজ পুত্র শোকে অধীর হইয়া, অবশিষ্ট সৈন্যসহ ঢাকা নগরে চলিয়া গেলেন। ফৌজদারের গমনের পরেও তাঁহার অনুচর মীর আতা চট্টগ্রাম হইতে অনেকগুলি যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়া, দক্ষিণশিক গড় পুনরাক্রমণ করিল। এবারও লুচিদর্পের প্রভাবে মীর আতা পরাভূত হইয়া, পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৬৮২ শকে জৈষ্ঠ্য মাসে এই সমর সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধ হইতেই মীর রাজ্যের জমিদারীর অধিকারের আকাঙ্খা প্রশমিত হয়।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের শাসনকাল

রাজ্যলাভের পূর্ব্বে যুবরাজ কৃষ্ণমণি যে সকল দুর্গতি ভোগ করিয়া ছিলেন, উপরে তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। ত্রিপুরার কোন ভূপতি ইহাঁর ন্যায় লাঞ্ছিত ও দুর্গতিগ্রস্থ হন নাই। দুর্গম পার্ব্বত্য পথে নানাস্থানে ভ্রমণ, কিরাত সংসর্গে কদর্য স্থানে বাস, কর্দয্য আহার গ্রহণ ও শত্রু কর্ত্তৃক বারম্বার আক্রান্ত হইয়া বার বৎসরকাল নানাবিধ দুঃখ কষ্ট ভোগের পর যুবরাজ কথঞ্চিত বিপদমুক্ত হইলেন।

অতঃপর যুবরাজ ১১৭০ ত্রিপুরাব্দে (১৬৮২ শক) আশ্বিন মাসের বিজয়া দশমী তিথিতে * কৃষ্ণমাণিক্য নাম গ্রহণ পূর্ব্বক কৈলাগড় দুর্গে (কসবায়) সিংহাসনারূঢ় হইলেন)। কৌলিক প্রথানুসারে রাজা ও পট্ট মহিষী জাহ্নবী মহাদেবীর নামাঙ্কিত সুবর্ণ মুদ্রা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহা ব্রাহ্মণদিগকে দান করা হইল। এই রাজ্যাভিষেক উৎসব বিপুল সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। রাজার অনুজ হরিমণি ঠাকুরকে এই সময় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ও গদাধর ঠাকুরের পুত্র বীরমণি ঠাকুরকে 'বড় ঠাকুর' উপাধি প্রদান করা হয়।

---

* আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব দশমীর দিনে।
ত্রিপুরা এগারশত সত্তেরের সনে॥
কৃষ্ণমাণিক্য রাজখ্যাতি হইল তখন।

রাজমালা-কৃষ্ণমাণিক্য খণ্ড, ৫০পৃষ্ঠা

এই সময় ত্রিপুরার ন্যায় মোগল সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্র বিপ্লবে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল। শাসনকর্তাগণের স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় বঙ্গ দেশের যে দুর্গতি ঘটিয়াছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সময়ের এবম্বিধ জটিল আবর্ত্তনে পড়িয়া মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্যকে রাজত্ব লাভের পূর্ব্বে অপরিসীম দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজ্যাভিষিক্তহইয়াও তিনি নিরাপদে কালক্ষেপ করিতে পারেন নাই। তাহার সিংহাসন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই চট্টগ্রামের সুবা (শাসনকর্তা) মহম্মদ রেজা খাঁ রোশনাবাদে স্বীয় অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণ সম্বন্ধে কৃষ্ণমালা গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে; -

"দক্ষিণশিকেতে কিল্লা করিয়া তখন।
সৈন্য সমে ছিল লুচিদর্প নারায়ণ ॥
সেই ঠাঁই রহে গিয়া জয়দেব রায়।
উপদ্রব উপস্থিত হইল তথায় ॥
চাটিগ্রামের সুবা মহম্মদ রাজা খাঁনে।
লইতে রোশনাবাদ করিলেক মনে ॥
তাঁহার দেওয়ান রামশঙ্কর আছিল।
যুদ্ধ হেতু সৈন্য সমে তাহাকে পাঠাইল ॥
সৈন্য অষ্ট হাজার সে লইয়া সহিত।
দক্ষিণশিকেতে আসি হইল উপস্থিত ॥"

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ১১৭০ ত্রিপুরাব্দে (১৭৬০ খ্রীঃ) রাজ্য লাভ করেন। চট্টগ্রামের ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়, মহম্মদ রেজা খাঁ ১৭৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে শাসনকর্তা পদে নিয়োজিত ছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণমাণিক্যের রাজ্যভিষেকের বৎসরই (রেজা খাঁ এর শাসনের শেষ সনে) রেজা খাঁ কর্ত্তৃক ত্রিপুরা আক্রান্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণমালায় পাওয়া যাইতেছে, সুবার দেওয়ান রামশঙ্কর এই আক্রমণের নেতা ছিলেন। রাজমালায়ও ইঁহার নামই পাওয়া যাইতেছে; -

"তারপরে রামশঙ্কর আসিল দেওয়ান ॥
চাটিগ্রাম হতে বহু সৈন্য যে লইয়া।
নুরনগর আসিলেক যুদ্ধ আকাঙ্খিয়া ॥"

চট্টগ্রামের ইতিহাসে ইংরেজ রাজত্বকালের দেওয়ানগণের নামের তালিকায় দেওয়ান রামশঙ্কর হাওলদারের নাম পাওয়া যায়। ইনি ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের অধীনে দেওয়ান ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। সুতরাং রামশঙ্কর ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে, মুসলমান শাসনকর্তার অধীনেও দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। সমগ্র অবস্থা আলোচনা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

দেওয়ান রাম শঙ্কর আট হাজার সৈন্যসহ দক্ষিণশিকের গড় আক্রমণ করিলেন। জয়দেব কবরা ও লুচিদর্প নারায়ণ মাত্র এক সহস্র সৈন্য লইয়া এই গড়ে অবস্থান করিতেছিলেন। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া জয় লাভের আশা না থাকিলেও সেনাপতিদ্বয় বিনা যুদ্ধে আত্মসর্মপণ কিম্বা পলায়ন করা কিছুতেই সঙ্গত মনে করিল না। বহুক্ষণ বিপুল প্রতাপের সহিত যুদ্ধ করিয়া, যখন আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন তাঁহারা দক্ষিণশিক গড় মুসলমানের হস্তে অর্পণ করিয়া, তিষ্ণা পরগণার অর্ন্তগত ফাল্গুন করা গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রামশঙ্কর প্রথম যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া, দ্বিগুন উদ্যেমে ফাল্গুনকরা গড় আক্রমণ করিলেন। এখানেও প্রবল যুদ্ধ হইয়াছিল। ত্রিপুর সেনানী বিপুল বাহিনী আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া, গড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কসরা দুর্গে রাজ সকাশে যাইয়া উপনীত হইলেন।

মহারাজ প্রতিপক্ষের বল জানিয়া, মন্ত্রীবর্গের পরামর্শানুসারে, সন্ধির প্রস্তাব করা সঙ্গত মনে করিলেন; এই প্রস্তাব সহ উত্তর সিং উজীরকে রামশঙ্কর দেওয়ানের নিকট প্রেরণ করা হইল। দেওয়ান সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, অধিকন্তু দূত স্বরূপ প্রেরিত উজীর উদর সিংহকে অবরুদ্ধ করিলেন। অতঃপর যুদ্ধ করাই স্থির হইল। দেওয়ানের পথ অবরোদ করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণপুরে ও কল্যাণ সাগরে দুইটি শিবির সন্নিবেশিত হইল।

রামশঙ্কর দেওয়ান বিজয়মদে উন্মত্ত হইয়া কৈলারগড় (কসবা) দুর্গ আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন। তিনি প্রত্যেক শিবিরের সম্মুখীন হইয়া প্রবল বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরিশেষে তাঁহারই জয় ঘটিল। রাস্তার আক্রমণ জনিত বাধা অতিক্রম করিয়া রামশঙ্কর কৈলারগড় দুর্গের সন্নিহিত হইলে, লুচিদর্প নারায়ণ দক্ষিণ কিল্লা হইতে তাঁহাকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিলেন। সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল, কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় হইল না। সন্ধ্যার সময় যুদ্ধ স্থগিত হইল, উভয় পক্ষ আপন আপন শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই যুদ্ধে দুই পক্ষেরই বিস্তর সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল।

পর দিবস প্রভাতকালে আবার তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা অত্যধিক, তাহারা দুর্গের তিন দিক ঘিরিয়া ফেলিল। উত্তর দ্বারে জয়সিংহ হাজারী তাঁহার অধীনস্থ মগ সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। মুসলমানগণ তাঁহাকে সম্যক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা আক্রমণ করিল। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য হত ও আহত হওয়ায়, তিনি পশ্চাদপসারণে বাধ্য হইলেন। এই সুযোগে একদল অরাতি সৈন্য দুর্জয় সাহসে নির্ভর করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিল। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য নিরুপায় হইয়া দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'ভাদুঘরে' কিয়ৎকাল অবস্থানের পর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া গমন করিলেন। দেওয়ান রামশঙ্কর দুর্গ হস্তগত করিয়া যথাযোগ্য স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। এবং স্বীয় প্রভু-সকাশে বিজয় বার্ত্তা প্রেরণ করিয়া, জয়স্কন্ধাবারে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের বিপদ অন্তত হইলেও পীঠ দেবী ত্রিপুরা সুন্দরীর অপার কৃপায় তিনি সকল বিপদ হইতেই সহজে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এবারও তিনি দেবীর কৃপায় বঞ্চিত হইলেন না। রামশঙকর হৃষ্টচিত্তে কালনেমীর লঙ্কাভাগের ন্যায় রাজ্য বিভাগের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, এই সময় অকস্মাৎ সংবাদ আসিল, মিষ্টার হারিভারলেষ্ট (Harryvarlest) বহু সৈন্য লইয়া চট্টগ্রাম আক্রমণ পূর্ব্বক, নবাব মহম্মদ রেজা খাঁকে বিতাড়িত ও নগর অধিকার করিয়াছেন। প্রভুর এই আকস্মিক বিপদের সংবাদ পাইয়া, রামশঙ্কর দলবলসহ উর্দ্ধশ্বাসে চট্টগ্রামের দিকে ধাবিত হইলেন। বিনা যুদ্ধে সমগ্র রাজ্য মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের হস্তগত হইল। রামশঙ্কর কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ উজীর উত্তর সিংহকে তিনি আপন সঙ্গে চট্টগ্রামে নিয়াছিলেন।

ইহার পর ইংরেজগণ চট্টগ্রামে শাসনের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। হারিভারলেষ্ট (Harryvarlest) চীফ অফিসার এবং Mr. Thomas Rumbold, Mr. Randolph Marriott ও Walter Willkins মেম্বার ও এসিস্ট্যান্ট পদে নিযুক্ত হন। গোকুল ঘোষাল তাঁহাদের দেওয়ান ছিলেন। ইঁহারা ১৭৬১ খ্রীঃ ৫ই জানুয়ারী তারিখে মহম্মদ রেজা খাঁ হস্ত হইতে শাসন ভার গ্রহণ করেন। সুচতুর উজীর উত্তর সিং রামশঙ্কর কর্ত্তৃক চট্টগ্রামে নীত হইয়াছিলেন, তিনি সুযোগ বুঝিয়া ইংরেজগণের সহিত মিলিত হইলেন। সাহেবগণও রাজকর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

ইঁহার অল্পকাল পরে চট্টগ্রামের চিফ অফিসারের এসিস্ট্যান্ট মিঃ রেণ্ডলপ্ মারিয়ট সাহেব ত্রিপুরার জমিদারী বিভাগে মুসলমান অধিকারের স্থলে ইংরেজ অধিকার স্থাপনের অভিপ্রায়ে কুমিল্লায় আগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে লেপ্টেনেন্ট মথি সাহেব পদাতি সৈন্যসহ আগমন করিয়াছিলেন। এই মথি সাহেবের নাম বিক্রিত করিয়া

কৃষ্ণমালা গ্রন্থে মাতিছ লিখিত হইয়াছিল।

লেপ্টেনেন্ট মথি কৈলারগড় দুর্গের সন্নিহিত স্থানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধের ফলাফল বড়ই অনিশ্চিত। তিনি কৈলারগড় দুর্গ সুরক্ষিত করিয়া, তিনকড়ি ঠাকুর, গোবর্দ্ধন ঠাকুর ও জয়দেব রায়কে সহ শিঙ্গারবিল গ্রামে গমন করিলেন। এই স্থানে তাঁহারা গোলমোহর সিংহের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন।

মথি সাহেব মহারাজের স্থানান্তরে গমনের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সংবাদ প্রেরণ করিলেন, - "যুদ্ধ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, জমিদারী বিভাগের বিহিত বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি।" তিনি মহারাজের সাক্ষাৎ লাভের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য হৃষ্টচিত্তে সাহেবের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত তাঁহার শিবিরে গমন করিলেন। মহারাজ 'মণিঅন্ধ' গ্রামে পৌঁছিলে, মথি সাহেব তাঁহার দেওয়ানকে অভ্যর্থনার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন।মহারাজ দেওয়ানের সঙ্গে শিবিরে উপস্থিত হইলে, সাহেব তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক উপবেশন করাইলেন। উভয়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় বাক্যালাপের পর, মহারাজ কৈলারগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে, মারিয়ট্ সাহেব উজীর উত্তরসিংহকে লইয়া কৈলারগড়ে আগমন করিলেন, তিনি কথি সাহেবের সহিত এক সঙ্গে বাস করিতেছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর মহারাজ সাহেবদ্বয়ের সহিত কুমিল্লায় গমন করিয়াছিলেন। অল্পকাল পরে, লেপ্টেনেন্ট মথি চট্টগ্রামে ফিরিয়া গেলেন। মারিয়ট্ সাহেব এবং মহারাজ ইহার পরেও চারি পাঁচ মাস কাল কুমিল্লায় ছিলেন। এই সময় মণিচন্দ্র নাজিরের মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভিমুন্যকে মহারাজ নাজিরের পদ প্রদান করেন। মারিয়ট্ সাহেব চট্টগ্রামে প্রত্যাগমন করিবার পর, মহারাজ ৺ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর অর্চ্চনা নিমিত্ত উদয়পুরে গমন করিয়াছিলেন।

উজীর উত্তর সিংহ, জয়দেব রায় ও গোবর্দ্ধন ঠাকুর কুমিল্লায় অবস্থান পূর্ব্বক শাসন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। নৃপতির আদেশে লুচিদর্প নারায়ণ থানাদার

(শাসনকর্ত্তা) রূপে দক্ষিণশিক গড়ে ছিলেন। এই সময় পূর্ব্ব পরাজিত আবদুল রেজাক পুনর্ব্বার লুচিদর্পকে আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া লুচিদর্প কুমিল্লাভিমুখে পলায়ন করিতেছিলেন, তাঁহার সাহায্যার্থ অভিযানকারী জয়দেব রায়ের সহিত পথিমধ্যে দেখা হইল। তখন উভয়ে মিলিত হইয়া ফাল্গুন করার গড়ে গমন করিলেন এবং তথা হইতে খণ্ডুলে চলিয়া গেলেন। সেখানে আবদুল রেজাকের পুত্র সদরগাজী কিল্লা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতেছিল, ত্রিপুর সেনাপতিদ্বয় তাহাকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে ত্রিপুরার জয়লাভ ঘটিল, সদরগাজী পলায়ন পূর্ব্বক দক্ষিণশিকে পিতৃ সকাশে উপস্থিত হইল, যুদ্ধ বিবরণ অবগত হইয়া আবদুল রেজাক ভীত হইয়া পুত্র প্রভৃতিকে সহ দক্ষিণশিক হইতে পলায়ন করিল।লুচিদর্প পুনর্ব্বার দক্ষিণশিকে যাইয়া সমসের গাজীর বাসভবনের উপর কিল্লা স্থাপন করিলেন। জয়দেব কবরা ছাগলনাইয়া গ্রামে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন।

কিয়দ্দশ নীরব থাকিয়া, আবদুল রেজাক তিন সহস্র সৈন্য লইয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণশিকে লুচিদর্পকে আক্রমণ করিল। এই সংবাদ পাইয়া সেনাপতি জয়দেব রায়, লুচিদর্পের সাহায্যার্থ ধাবিত হইলেন। আবদুল রেজাক সেনাপতিদ্বয় কর্ত্তৃক দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া, সৈন্য সমরানলে বিসর্জ্জন করিল। ত্রিপুর সৈন্যগণ পলায়মান আবদুল রেজাকের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, পথে পথে তাহার সৈন্যদিগকে বধ করিতেছিল, অনেকে পলায়ন করিতে গিয়া ফেনী নদীতে ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

ইহার অল্পকাল পরে, মুরশিদাবাদের দরবার কর্ত্তৃক নিয়োজিত ফৌজদার মহাসিংহ কুমিল্লায় আগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে মাখনলাল নামক এক ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। ফৌজদারের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে লুচিদর্প ও জয়দেব দক্ষিণ শিক হইতে কুমিল্লায় আসিয়া ফৌজদারের সঙ্গে দেখা করিলেন, এবং তাঁহারা মাখনলালকে লইয়া কৈলারগড়ে মহারাজ সদনে চলিয়া গেলেন। মাখনলাল, মহারাজ কর্ত্তৃক নায়েবের পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কুমিল্লায় ফৌজদারের সঙ্গে থাকিয়া খাজানা আদায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য দেখিলেন, প্রবল বহিঃশত্রু মঘ ও মুসলমান কর্ত্তৃক উদয়পুর বারম্বার আ ক্রান্ত হইতেছে। সেইস্থানে রাজধানী রাখা তিনি নিরাপদ মনে করিলেন না। অনেক চিন্তার পরে কৈলারগড়ের সন্নিহিত আগরতলায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা

করা সঙ্গত বিবেচিত হওয়ায়, ১১৭০ ত্রিপুরাব্দে তথায় নগর সংস্থাপিত হইয়াছিল। * এই সময় হইতে উদয়পুরের রাজধানী জনিত গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে।

এই সময় পুনর্ব্বার কতিপয় সম্প্রদায়ের কুকি বিদ্রোহী হইয়া কর বন্ধ করে। তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত গোবর্দ্ধন ঠাকুর ও ভদ্রমণি সেনাপতি প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা বিদ্রোহীদিগকে সম্যকরূপে দমিত ও করপ্রদ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময় মহারাজ আগরতলা ছাড়িয়া কৈলারগড় দুর্গে বাস করিতেছিলেন।

কুকি দমনের অল্পকাল পরে, চট্টগ্রামের চীফ্ হারিভারলেষ্ট, কাপ্তেন সুলটিন, লেপ্টেনেন্ট ইষ্টবিল প্রভৃতি আটজন ইংরেজ, তাঁহাদের দেওয়ান গোকুল ঘোষালকে সহ বহু সৈন্য সঙ্গে লইয়া কসবায় যাইয়া ছাউনী করিলেন। ইঁহারা ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। ইংরেজবাহিনী কসবায় অবস্থানকালে ত্রিপুরেশ্বর তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। হারিভারলেষ্ট মহারাজকে এই অভিযানে যোগদানের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। রাজ কার্য্যানুসারে তিনি স্বয়ং যাইতে না পারিয়া, জয়দেব রায় ও লুচিদর্পনারায়ণকে সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছিলেন।

ইংরেজবাহিনী হেড়ম্ব রাজ্যে উপস্থিত হইলে তত্রত্য রাজা, স্বীয় রাজধানী খাসপুর অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করিয়া, রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। ইংরেজ সৈন্যগণ বিশ্রামার্থ সেই স্থানে শিবির সংস্থাপন করিল। এই সংবাদ আসিল, মুরশিদাবাদের নবাব কাশীম আলি খাঁ এর (মির কাশিমের) দেওয়ান বৃন্দাবন, ঢাকায় আসিয়া নবাব সৈন্য সাহায্যে তথাকার ইংরেজদিগের কুঠি সমূহ লুন্ঠন করিতেছে। হারিভারলেষ্ট সাহেব, বৃন্দাবনের কার্য্যে বাধা প্রদানের জন্য সুলটিন সাহেবকে ঢাকায় প্রেরণ করিলেন। কাপ্টেন সুলটিন, বৃন্দাবন দেওয়ানকে পরাভূত করিয়া মুরশিদাবাদ আক্রমন ও নবাব কাশীম আলি খাঁকে পরাভূত করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই বাঙ্গালা দেশে ইংরেজাধিকার স্থাপনের সূচনা হয়।

এগার শ সত্তের সন হ এত যখন।
আগরতলা রাজধানী করিল রাজন ।।

কৃষ্ণমাণিক্য খণ্ড - ৫১পৃষ্ঠা

অতঃপর হারিভারলেষ্ট সাহেব ব্রহ্মদেশের দিকে অগ্রসর না হইয়া, হেড়ম্ব হইতে চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জয়দেব এবং লুচিদর্পও স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে খুচুং কুকিগণ পুণরায় বিদ্রোহী হওয়ায়, লুচিদর্প পথ হইতে তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত পর্ব্বতে গমন করেন, জয়দেব রায় রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

বঙ্গদেশ ইংরাজাধিকার হইয়াছে জানিয়া মহারাজ, জয়দেব উজীরকে মৈত্রী স্থাপনের নিমিত্ত চট্টগ্রামে হারিভারলেষ্ট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। সাহেব মহারাজের আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, -'আমরা কখনও ত্রিপুরার পক্ষ পরিত্যাগ করিব না।' এই সংবাদ পাইয়া মহারাজ নিশ্চিন্ত হইলেন।

রাজ্যে নানাবিধ বিপ্লব হেতু মহারাজ, পরিবারবর্গকে এতকাল খোয়াই নদীর তীরে রাখিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদিগকে আগরতলায় আনা হইল। অন্যান্য অনুচরবর্গ আগরতলায় বসতি স্থাপন করিলেন। ৺বৃন্দাবনচন্দ্র দেবতা উদয়পুর হইতে আনয়ন করিয়া এই সময় আগরতলায় এক সুরম্য মন্দিরে স্থাপন করা হইয়াছিল।

সেনাপতি গোবর্দ্ধন রায় ও ভদ্রমণি কিরাতদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। আবদুল রেজাক, সাহা মহাম্মদ নামক জনৈক জমাদারকে যুদ্ধার্থ সেই স্থানে প্রেরণ করিল। গোমতী নদীর তীরবর্ত্তী কিল্লা হইতে গোবর্দ্ধন রায় তাহাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ইহার পরেও আবদুল রেজাক ক্রমান্বয়ে দুইবার দক্ষিণশিকের কিল্লা আক্রমণ করিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় যুদ্ধাকাঙ্খা পরিত্যাগ করিয়া, ভোজপুরে অবস্থান পূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিল। তাহার দস্যুতা মাত্রা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তৎফলে সে নবাব কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মুরশিদাবাদে নীত ও সমসের গাজীর ন্যায় তোপের মুখে হত হইয়াছিল।

এই সময় উজীর উত্তর সিংহ পরলোক গমন করায় মহারাজ, জয়দেব ঠাকুরকে উজীর, বীরমণি ঠাকুরকে নায়েব উজীর, হীরমণিকে কারকূন, মাখনলাল ও রামকেশব কে নায়েব, পদ্মনাভ ও পঞ্চাননকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এই সময় মহম্মদ আলী বা মরাম্মত আলী নামক এক ব্যক্তি নবাব কর্ত্তৃক ফৌজদার পদে নিযুক্ত হইয়া কুমিল্লায় আগমন করিলেন। ময়ূর (Mr. Mayer) নামক

এক সাহেব তৎকালে চট্টগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। এই দুই ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া রোশনাবাদ প্রদেশকে ত্রিপুরার অঙ্গচ্যুত করিবার চেষ্টা প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা কপট ব্যবহার দ্বারা রাজ ভাগিনেয় বীরমণি ঠাকুর এবং ভদ্রমণি দেওয়ান ও হারিধন লস্করকে বন্দি করিয়া যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিল। রাজপক্ষ সসজ্জ হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। অতঃপর কমলাসাগরের তীরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ত্রিপুরার সৈন্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া কেহ দুর্গ রক্ষার্থ এবং কেহ বিপক্ষের গতি রোধের নিমিত্ত অগ্রসর হইল। রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে আরম্ভ হইয়া, পরদিন অধিক বেলা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিয়াছিল। তুমুল সংগ্রামের পর অরাতি পক্ষের পরাজয় ঘটিল। পরাহত মিঃ মায়ার ও মহম্মদ আলী ঢাকা নগরীতে প্রস্থাণ করিল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও মহারাজ সুখী হইতে পারিলেন না; তাঁহার ভাগিনেয় বীরমণি ঠাকুর, ভদ্রমণি দেওয়ান ও হারিধন শত্রু হস্তে বন্দী থাকায়, তাহাদের জন্য মহারাজ বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন।

মহারাজ ছত্র মাণিক্যের প্রপৌত্র বলরাম রায় ঢাকায় ছিলেন, তিনি সুযোগ পাইয়া, রোশনাবাদের অধিকার লাভের নিমিত্ত মুরশিদাবাদের নবাব দরবারে প্রার্থী হইলেন। নবাবের সহিত ত্রিপুরেশ্বরের অসদ্ভাব থাকায়, এই প্রার্থনা সহজেই কার্যকরী হইল, এবং নবাবের অনুমতি পাইয়া, বিপুল সেনাবাহিনীসহ কাদবায় যাইয়া বলরাম মাণিক্য নাম গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের নাজির রাজকীর্তি নারায়ণের পৌত্রের নামও বলরাম ছিল। এই ব্যক্তি যাইয়া বলরাম মাণিক্যের সহিত মিলিত হইলেন; এবং রাজার আদেশানুসারে সৈন্য লইয়া মির্জাপুরে যাইয়া শিবির স্থাপন করিলেন। এই সময় মায়ার সাহেবের সৈন্যগণ পুনর্ব্বার দক্ষিণশিক গড় আক্রমণ করিল। এবারও তাহাদিগকে বিফল মনোরথ হইয়র প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

বলরাম মাণিক্যের সৈন্যগণ মির্জাপুরে শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুমিল্লা আক্রমণের নিমিত্ত যাত্রা করিল। উজীর জয়দেব ঠাকুর সৈন্যবল সহ কুমিল্লায় অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি শত্রুপক্ষের অভিযান বার্ত্তা পাইয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। আমতলী গ্রামের উভয়পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হওয়ায়, ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বলরাম মাণিক্যের অনুচর বলরাম ঠাকুর এই যুদ্ধে প্রধান নায়ক ছিলেন, তিনি যুদ্ধে পরাভূত হইয়া কাদবায় ফিরিয়া গেলেন।

এই বলরাম ঠাকুর জয়দেব উজীরের মাতুল ছিলেন। উজীর গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া কৌশল ক্রমে বলরামকে, রাজা বলরামের পক্ষ ত্যাগ করাইয়া, ত্রিপুরেশ্বরের বশীভূত করিয়াছিলেন। অতঃপর বলরাম কাদবা পরিত্যাগ করিয়া কুমিল্লায় গমন করেন। বলরাম মাণিক্য কাদবায় অবস্থান করিয়া, পুনরাক্রমণের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন।

এদিকে ইংরেজ সৈন্য খণ্ডলে আসিয়া ছাউনী করিল। আছুমণি ঠাকুর বাতিশা থানায় অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি খণ্ডলে যাইয়া ইংরেজ শিবির আক্রমণ করিলেন, কিন্তু প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও ফল লাভে সমর্থ হইলেন না। ইংরেজ সৈন্য পরাজিত আছুমণিকে বন্দী অবস্থায় চট্টগ্রামে নিয়া, তথা হইতে ঢাকার নবাব সদনে প্রেরণ করিল। ইংরেজগণ নবাবের নিয়োজনমতে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

অতঃপর ইংরেজ সৈন্য মিরজাপুরে আগমন করিল। ইহাতে জয়দেব উজীর ও লুচিদর্প নারায়ণ ভীত হইয়া, কুমিল্লা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কসবায় রাজ সন্নিধানে গমন করিলেন। ইংরেজ সৈন্যও মিরজাপুর পরিত্যাগ করিয়া বায়েক গ্রামে যাইয়া ছাউনী করিল।

দুর্জ্জয় ইংরেজ শক্তির সহিত যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া, মহারাজ পুরাতন বন্ধু হারিভারলেষ্ট সাহেবের সাহায্য লাভের আশায় কলিকাতা গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি জয়দেব উজীর প্রভৃতির প্রতি রাজ পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ ভার অর্পণ করিয়া, অল্পসংখ্যক অনুচরসহ ১১৭৬ ত্রিপুরাব্দের পৌষ মাসে কৈলারগড় হইতে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। *

নৃপতির প্রস্থানের পর, জয়দেব উজীর প্রভৃতি সকলেই কসবার দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগরতলায় গমন করিয়া যুবরাজ হরিমণি ঠাকুরের নিকট সমস্ত অবস্থা স্তাপন করিলেন। যুবরাজ পরিবারবর্গকে নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং মন্ত্রীবৃন্দসহ আগরতলায় রহিলেন। সৈন্য সমাবেশ দ্বারা আগরতলার চতুর্দ্দিক সুরক্ষিত হইল।

---

* ত্রিপুর এগার শত ছিয়াত্তর সন।
পৌষ মাসে নৃপ কলিকাতায় গমন॥
কৃষ্ণমালা।

বলরাম মাণিক্য কাদবায় থাকিয়া সময়ের প্রতিক্ষা করিতেছিলেন। এখন সুযোগ বুঝিয়া নবাব কর্তৃক নিযোজিত ফৌজদাবের স্থলবৰ্ত্তী আগাছালের সাহায্যে কুমিল্লা নগরী অধিকার করিয়া বসিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের কলিকাতা গমনের সংবাদ পাইয়া ইংরেজ সেনাপতি কিংলাক, বায়েক হইতে ভাটামাথা গ্রামে যাইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। এবং যুদ্ধাকাঙ্খা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যুবরাজকে তাঁহার সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই, সাহেবের দেওয়ান আসিয়া এরূপ প্রতিশ্রুতি দান না করিলে, যুবরাজ সাহেবের নিকটে গমনে অস্বীকৃত হইলেন। সাহেব এই সংবাদ অবগত হইয়া, স্বীয় দেওয়ান রামকান্ত বসুকে রাজধানীতে প্রেরণ করেন। যুবরাজের প্রত্যয়ের নিমিত্ত রাজসরকারী নায়েব মাখনলালও সাহেবের অনুরোধে উক্ত দেওয়ানের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া যুবরাজকে জানাইলেন, - "মহারাজের কলিকাতা যাত্রার সংবাদ পাইয়া, সাহেব যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া, মিত্রতা স্থাপনের নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন।" ইহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া যুবরাজ বহুসৈন্যসহ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আমুদাবাদের পথে যাত্রা করিলেন। তিনি বিজয় নদীর তীরে উপনীত হইয়া সৈন্যগণকে তথায় রক্ষা করতঃ অল্প সংখ্যক লোকসহ ইংরেজ শিবিরে গমন করিলেন। এই সাক্ষাতের ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল, এবং মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ সাহেব বিশেষ আদরের সহিত যুবরাজকে একটি উৎকৃষ্ট বন্দুক, একটি পিস্তল ও একথান বনাত উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় উজীর জয়দেব ঠাকুর ও নায়েব মাখনলাল যুবরাজের সঙ্গে ছিলেন। অতঃপর সৈন্যাধ্যক্ষ কিংলাক যুবরাজের অনুরোধে ভাটামাথা ছাড়িয়া কিয়ৎকাল আগরতলার সন্নিহিত কালিকাগঞ্জে অবস্থানের পর, কুমিল্লায় গমন করিলেন, যুবরাজ তাঁহার সঙ্গে কুমিল্লায় গিয়াছিলেন। জয়দেব উজীর আগরতলায় প্রত্যাবৰ্ত্তন করিলেন।

কিংলাক যুবরাজকে সহ কুমিল্লায় যাইয়া দেখিলেন, বলরাম মাণিক্য নবাবের কর্ম্মচারীর সঙ্গে সেই স্থানে আছেন। যুবরাজকে সমাগত দেখিয়া জগৎমাণিক্যের মনে দুরভিসন্ধি জন্মিল। ঢাকা নগরে বলরাম মাণিক্যের সাহায্যেকারী 'সিক' নামক এক সাহেব ছিলেন। তিনি বলরামের অনুরোধ রক্ষার নিমিত্ত, যুবরাজকে বন্দীভাবে ঢাকায় প্রেরণ করিবার নিমিত্ত কিংলাক সাহেব নিকট পত্র লিখিলেন। কিংলাক এই পত্র পাইয়া রাগান্বিত হইয়া উত্তর প্রদান করিলেন, "যুবরাজকে আমি কুমিল্লায় আনয়ন করিয়াছি,

তাঁহাকে নিরাপদে রাখিব এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। সুতরাং আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া, যুবরাজকে প্রেরণ করিতে পারিব না। এই উত্তর দানের পর সাহেব বহু সংখ্যক রক্ষী সঙ্গে দিয়া যুবরাজকে আগরতলায় প্রেরণ করিলেন। এবং নায়েব মাখনলাল ঢাকায় যাইয়া সিক সাহেবকে বাধ্য করতঃ যুবরাজের ঢাকায় যাইবার আদেশ রহিত করাইলেন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য কলিকাতায় যাইয়া প্রথমেই ৵ভবানীর অর্চ্চনা করিলেন। তৎপর হারিভারলেষ্ট সাহেবের দেওয়ান পূর্ব্বপরিচিত গোকুল ঘোষালের সাহায্যে সাহেবের সহিত দেখা করেন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের সহিত হারিভারলেষ্টের পূর্ব্বেই সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল, তিনি তাঁহার বিপদের বিষয় অবগত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং মহারাজকে রোশনাবাদের বন্দোবস্ত প্রদান জন্য মুরশিদাবাদের নবাব নামে এক অনুরোধ পত্র লিখিয়া, মহারাজের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে মুরশিদাবাদে যাইতে বলিলেন। তখনও সুবে বাঙ্গলার শাসনভার নবাবের হস্তেই ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী সূত্রে শাসনভার লাভ করিয়াছেন। হারিভারলেষ্ট সাহেব নিতান্ত সুজন এবং হৃদয়বান লোক ছিলেন। নবাব দরবারের অবস্থা কিছুই তাঁহার অগোচর ছিল না। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যকে মুরশিদাবাদে প্রেরণ করিয়া তিনি ভাবিলেন, দরবারে কি অবস্থা দাঁড়াইবে, তাহা অনিশ্চিত, তিনি স্বয়ং গেলে মহারাজের কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। ইহা মনে করিয়া তিনিও মুরশিদাবাদে যাত্রা করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই নবাব দরবার হইতে মহারাজ রোশনাবাদের বন্দোবস্ত পাইলেন। এবং বলরাম মাণিক্য ও তৎসঙ্গে নিয়োজিত আগাছালকে রোশনাবাদ হইতে উঠাইয়া আনিবার আদেশ হইল।

মহারাজের রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই উক্ত আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুমিল্লা পল্টনের কর্ত্তা লেপ্টেনেন্ট আলিগহরের * আদেশ মতো বলরাম মাণিক্য, আগাছালকে সহ রোশনাবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। রাজ পক্ষে কাগজ পত্র বুঝিয়া লইবার নিমিত্ত লেপ্টেনেন্ট যুবরাজকে পত্র লিখিলেন। তদনুসারে উজীর কুমিল্লায় যাইয়া কর্ম্মচারীবর্গ সহ কাগজ পত্র বুঝিয়া লইয়া সাহেবকে রসিদ প্রদান করিলেন।

মহারাজ, নবাব দরবার হইতে বন্দী বীরমণি, ভদ্রমণি ও হাড়িধনকে মুক্ত করিলেন এবং কলিকাতায় যাইয়া, হারিভারলেষ্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া কৃতজ্ঞতা

---

* ইংরেজের আলি গহর নাম বিশুদ্ধ নহে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এখন প্রকৃত নাম জানা সম্ভবপর নহে।

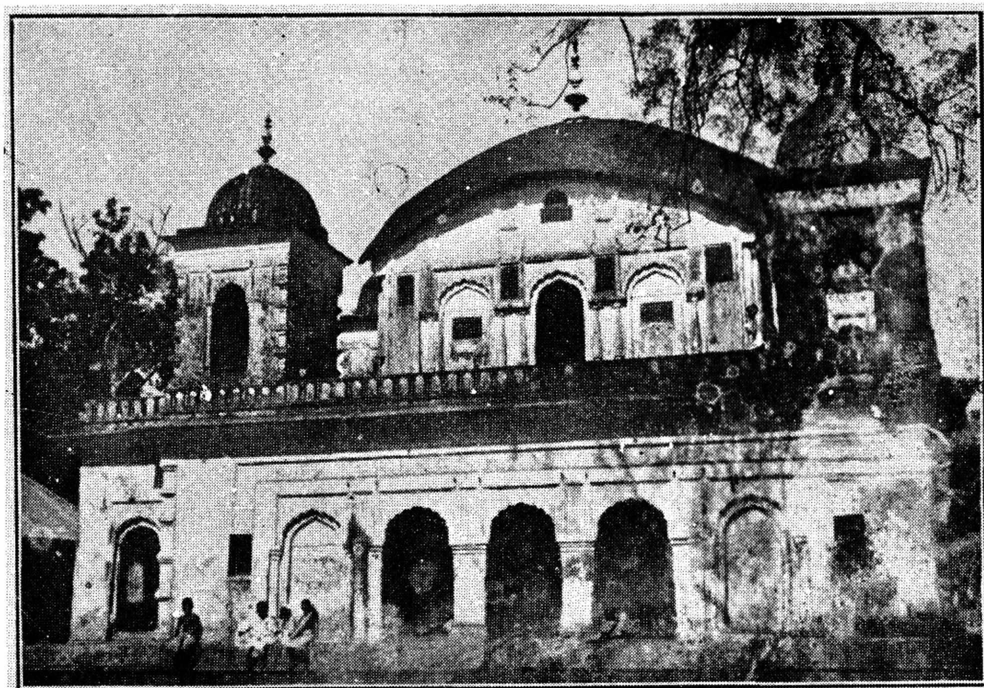

রাধামাধবের মন্দির, রাধানগর, আখাউরা (বর্ত্তমানে ইহা ভগ্নস্তুপে পরিণত)

জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর ঢাকায় যাইয়া বন্দী আছুমণি ঠাকুরকে মুক্তকরতঃ চট্টগ্রামে গমন করিলেন। এবং তত্রত্য বড় সাহেব ছেণ্ডেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ১১৭৭ ত্রিপুরাব্দে (১১৭৭ খ্রীঃ) কার্ত্তিক মাসে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

অতঃপর মহারাজ রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া ধর্ম্ম কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি দেবালয় গঠন, দেবতা স্থাপন, জলাশয় প্রতিষ্ঠাদি যে সমস্ত পুণ্যজনক কার্য্য করিয়াছেন. পূর্ব্বে তৎসমস্তের উল্লেখ করায় এস্থলে পুনরালোচনা করা হইল না। তিনি অবসর কাল ধর্ম্ম ও শাস্ত্র চর্চ্চায় অতিবাহিত করিতেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য নিঃসন্তান থাকায়, তাঁহার অনুজ যুবরাজ হরিমণি ঠাকুর একাধারে মহারাজের ভ্রাতৃ বাৎসল্য ও অপত্য স্নেহের অধিকারী হইয়াছিলেন। বিধি বিড়ম্বনায় ১৬৯৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে যুবরাজ পরলোক গমন করিলেন। দুর্ব্বিসহ বিপদের সময় যিনি ছায়ার ন্যায় অগ্রজের সঙ্গে ছিলেন, সেই অনুগত একমাত্র স্নেহের আধার যুবরাজের অকাল মৃত্যুতে রাজা এবং রাজ পরিবারস্থ সকলেই শোকে মুহ্যমান হইলেন। যুবরাজের রাণী রত্নমালা দেবী পতিসহ চিতায় আরোহণ করিলেন। তাঁহার ভাগ্যবতী নাম্নী অপরারাণী (মহারাজ রাজধর মাণিক্যের জননী) পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই দেশের সর্ব্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। এই সময় কিমিল সাহেব (Cambell ?) কাউন্সিলের প্রধান নেতা এবং শোর (Mr. John Shore) সাহেব মেম্বার নিযুক্ত হন। লিক সাহেব (Mr. Rolph Leeke) ত্রিপুরার রেসিডেন্ট পদ লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে রোশনাবাদের পুনর্ব্বন্দোবস্তের অনুষ্ঠান হয়। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য, সুদক্ষ কর্ম্মচারীসহ মাণিক চন্দ্র ঠাকুরকে বন্দোবস্ত কার্য্য সম্পাদন জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন। তৎপর রাজধর ঠাকুরকেও প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু লিক সাহেব বিরুদ্ধাচারণ করায় কার্য্য সম্পাদন পক্ষে বিঘ্ন ঘটিল। অল্পদিন পরে শোর সাহেব ঢাকায় আগমন করায়, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য তথায় যাইয়া বন্দোবস্ত গ্রহণ জন্য চেষ্টা করিলেন। এবারও লিক্ সাহেবের বিপক্ষতার দরুণ মহারাজ অকৃতকার্য্য হইয়া রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য বাতব্যাধি রোগে আক্রান্ত হইলেন, তিনি বহু উপদ্রব ভোগের সহিত ২৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া, ১৭০৫ শকের (১১৯৩ ত্রিপুরাব্দ) আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে লীলা সম্বরণ করেন। বিপুল সমারোহে তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পাদিত

হইল। মহারাণী জাহ্নবী মহাদেবী পতির চিতারোহণের সঙ্কল্প পূর্ব্ব হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার সেই সঙ্কল্প পূর্ণ হয় নাই।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য

পূর্ব্বোক্ত মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের ভ্রাতা হরিমণি যুবরাজ। এই যুবরাজের প্রপৌত্র মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের ঈশানচন্দ্র, উপেন্দ্রচন্দ্র, বীরচন্দ্র, চক্রধ্বজ, মাধবচন্দ্র, যাদবচন্দ্র, নীলকৃষ্ণ, সুরেশকৃষ্ণ ও শিবচন্দ্র নামক নয়টি কুমার বিদ্যমান ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণকিশোরের পরলোক গমনের পর, ঈশানচন্দ্র মাণিক্য রাজত্ব লাভ করেন। তিনি স্বীয় অনুজ উপেন্দ্রচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। কালচক্রে, মহারাজের বিদ্যমান কালেই (১২৬১ ত্রিপুরাব্দের ২রা বৈশাখ) যুবরাজ দেহলীলা সম্বরণ করেন।

অতঃপর মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ১২৭২ ত্রিপুরাব্দের ১৭ই শ্রাবণ তারিখে অনন্তধামে গমন করেন। তাঁহার পরলোক গমনকালে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ও নবদ্বীপচন্দ্র নামক দুইটী অল্প বয়স্ক কুমার বিদ্যমান ছিলেন।

মহারাজ ঈশানচন্দ্রের পরলোক যাত্রার পর, তাঁহার 'শ্রীগুরু আজ্ঞা' মোহরাঙ্কিত একখানা রোবকারী প্রচারিত হয়। সেই রোবকারীর প্রতিলিপি অপর পৃষ্ঠায় প্রদান করা যাইতেছে।

শ্রীগুরু আজ্ঞা

শ্রীশ্রী সহি।*

রোবকারীর কাছারী এলাকে রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা,
হুজুর শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য
বাহাদুর। ইতি সন ১২৭২ ত্রিপুরা,
তারিখ ১৬ই শ্রাবন।

এপক্ষ বাতব্যাধি পীড়াতে শারীরিক কাতর হওয়া প্রযুক্ত, রাজত্ব ও জমিদারী

* ইহা মহারাজের গুরু ও মন্ত্রী প্রভুপাদ স্বর্গীয় বিপন বিহারী গোস্বামী মহোদয়ের স্বাক্ষর। তিনি স্বীয় নামের পরিবর্ত্তে "শ্রীশ্রী সহি" স্বাক্ষর করিতেন।

শাসন বিষয়ী কার্য্য সুচারুমতে নির্ব্বাহ হইতেছে না, এবং যে প্রকার ব্যামোহ, ইচ্ছাধীন কোন সময় প্রাণ বিয়োগ হয় তাহারও নিশ্চয় নাই। এ মতেই এপক্ষের খান্দানের চির রীতিমতে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ তদর্থক যুবরাজ ও বড়ঠাকুর ও কর্ত্তা নিযুক্ত করা প্রয়োজন, সেমতে হুকুম হইল যে, -
যুবরাজী পদে এপক্ষের ভ্রাতা শ্রীলশ্রীমান বীরচন্দ্রচন্দ্র ঠাকুর ও বড়ঠাকুরী পদে প্রথম পুত্র শ্রীলশ্রীমান ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুর ও কর্ত্তা পদে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীলশ্রীমান নবদ্বীপচন্দ্র ঠাকুরকে নিযুক্ত করা যায় ও এ বিষয়ের এত্তেলা স্বরূপ এই রোবকারীর এক এক কিত্তা নকল জেলা চট্টগ্রাম ও জেলা ঢাকা প্রদেশের শ্রীলশ্রীযুক্ত দায়ের সায়ের কমিসনর সাহেব বাহাদুরান ও জেলা ত্রিপুরা ও জেলা শ্রীহট্টের শ্রীলশ্রীযুক্ত জজ্ সাহেব ও শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব ও শ্রীযুক্ত মাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুরান হুজুরে প্রেরণ হয় ইতি।
মোকাবিলা-

শ্রীগুরুদাস বর্দ্ধন, পেস্কার। — শ্রীশ্রীসহী। — মং শ্রীবিশ্বনাথ গুপ্ত, মোহরের।

এই রোবকারীর তারিখ আলোচনায় বুঝা যায়, মহারাজের পরলোক গমনের পূর্ব্ব দিবস ইহা সম্পাদিত হইয়াছিল। চক্রধ্বজ ও নীলকৃষ্ণ নামক স্বর্গীয় মহারাজের কুমারদ্বয়, উক্ত রোবকারী কৃত্রিম বলিয়া, রাজ্যের উপর দাবি স্থাপনার্থ গবর্ণমেন্ট সমীপে প্রার্থী হইলেন। ত্রিপুরার মাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট মূলে চট্টগ্রামের কমিসনার সাহেব বেঙ্গল গবর্ণমেন্টকে লিখিলেন, - "ত্রিপুরেশ্বর ঈশানচন্দ্র মাণিক্য স্বর্গীয় হইয়াছেন, রাজ্যের অনেকগুলি দাবিদার উপস্থিত, তন্মোধ্যে বীরচন্দ্র রাজা ও ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের নাবালক পুত্রদ্বয় (ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ও নবদ্বীপচন্দ্র) যথাক্রমে যুবরাজ ও বড় ঠাকুর স্বরূপ এইক্ষণ দখলকার আছেন। অতএব আমার বিবেচনায় গবর্ণমেন্ট একজনকে দখলকার রাজা স্বীকার করিয়া, অন্যান্য দাবিদারগণকে দেওয়ানী আদালতে যাইয়া জমিদারীতে স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য উপদেশ করিলেই চলিতে পারে।" * তদনুসারে বঙ্গের লেপ্টনেন্ট গভর্ণর, বীরচন্দ্র ঠাকুরকে ত্রিপুরার 'ডিফেক্টো' (*de facto*) রাজা স্বীকার করিয়া, অন্যানা দাবিদারকে উচিত পন্থা অবলম্বন জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ত্রিপুরা রাজ্যে ও জমিদারীতে অধিকার লাভ করেন।

* Commissioner's letter to the Secretary to the Government ofBengal, No. 359B. Dated 7th August, 1862.

স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর

ইহার অল্পকাল পরে, কুমার চক্রধ্বজ ও নীলকৃষ্ণ, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের বিরুদ্ধে, জমিদারীর স্বত্ব সাব্যস্ত জন্য দুইটী মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিযোগের প্রধান হেতু এই যে, মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য যুবরাজ প্রভৃতি নিয়োগ না করিয়াই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মহারাজ বীরচন্দ্র, গুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী প্রমুখ প্রধান কর্ম্মচারীবর্গের সহযোগে, তাঁহার যুবরাজ নিয়োগ সম্বন্ধীয় অমূলক রোবকারী প্রচারদ্বারা অন্যায়ভাবে রাজ্য ও জমিদারীতে অধিকার স্থাপন করিয়াছেন। স্বর্গীয় রাজার ভ্রাতাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিধায় তাঁহারাই রাজ্য ও জমিদারীর প্রকৃত স্বত্বাধিকারী। এস্থলে অভিযোক্তাগণ প্রত্যেকেই নিজকে জ্যেষ্ঠ বলিয়াছিলেন।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য উভয় মোকদ্দমায় এই মর্ম্মে বর্ণনা দাখিল করিলেন যে, তিনি মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য হইতে যৌবরাজ্য লাভ করিয়াছেন, সুতরাং রাজ্য ও জমিদারীর তিনিই প্রকৃত অধিকারী।

সকল পক্ষই আপন আপন দাবী সমর্থন জন্য ঠাকুর বংশীয় অনেক ব্যক্তিকে সাক্ষী মান্য করিলেন। ঠাকুরগণ নানা কারনে প্রভু গোস্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই সময় তাঁহাদের অনুরোধে প্রভুকে মন্ত্রীত্ব পদ হইতে অবসর করা হইল, এবংতাঁহার শ্রীপাট ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল।

অতঃপর মহারাজ বীরচন্দ্র ঠাকুরবংশীয়গণের সম্মতিতে রাজ্য ও জমীদারীর শাসনভার ঠাকুর ব্রজমোহন দেববর্ম্মণ মহোদয়ের হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রজমোহন ঠাকুর নানা কারণে কার্য্য পরিচালনে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছিলেন।

বৃটিশ আদালতের বিচারে ১৮৬৪ ইং ১১ই জুন তারিখে মহারাজ বীরচন্দ্রের দাবি অগ্রাহ্য ও কুমার নীলকৃষ্ণের অনুকূলে মোকদ্দমা ডিক্রী হইল। নীলকৃষ্ণ বাহাদুরের আর অপেক্ষা সহ্য হইল না, তিনি ডিক্রী জারী করিয়া চাকলে রোশনাবাদ জমীদারীতে দখল গ্রহণ করিলেন। এই দখল ২০ দিবস মাত্র স্থিরতর ছিল।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য হাইকোর্টের আপীলে সম্পত্তি ফিরিয়া পাইলেন। চিফ জাষ্টিস নরমেন ও জষ্টিস কেম্প কর্ত্তৃক ১৮৬৪ খ্রীঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই আপীল নিষ্পত্তি হইয়াছিল। অতঃপর নীলকৃষ্ণ বাহাদুর প্রিভিকাউন্সিলে আপীল

করিয়াছিলেন, ১৮৬৯ খ্রীঃ ১৫ই মার্চ্চ তারিখে সেই আপীল অগ্রাহ্য হয়। এই সময় মহারাজ বীরচন্দ্র নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগের সুবিধা লাভ করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রজাগণের মধ্যে জমাতিয়া সম্প্রদায় যোদ্ধা জাতি ছিল। ইহারা পূর্ব্বে ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিত। 'জমায়েৎ' শব্দ দ্বারা দলবদ্ধ বা সমবেত লোক সমষ্টিকে বুঝায়। ইহাদের দ্বারা গঠিত সেনাদলকে 'জমাৎ' বলা হইত, এই কারণেই ইহারা 'জমাতিয়া' আখ্যা লাভ করিয়াছে। ইহারা শৌর্য্য বীর্য্যশালী হইলেও শান্তিপ্রিয়, কিন্তু কোন দিনই নীরবে অত্যাচার সহ্য করিতে অভ্যস্ত নহে।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের শাসনের প্রারম্ভ কালে, যখন চতুর্দ্দিক হইতে জমিদারীর দাবিদারগণের উত্থাপিত দাবি উপেক্ষার নিমিত্ত তিনি ব্যস্ত ছিলেন, এই সময় ওয়াখিরায় হাজারী নামক জনৈক রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া জমাতিয়াগণ বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ১২৭৩ ত্রিপুরাব্দের ঘটনা। ইহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত ত্রিপুরেশ্বর প্রথমে যে সৈন্যদল প্রেরণ করেন, তাহারা বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইল না। পরিশেষে ডার্লং সম্প্রদায়ের কুকিদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। কুকিগণ জমাতিয়া দিগের বহুসংখ্যক লোক নিহত ও তাহাদের নেতা পরীক্ষিৎ সরদারকে ধৃত করিয়া এই বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত করিয়াছিল।নিহত জমাতিয়াগণের দুইশতেরও অধিক ছিন্নমুণ্ড রাজধানী আগরতলায় আনয়ন করা হয়। সাধরণকে রাজদ্রোহের পরিনাম ফল দেখাইবার নিমিত্ত সেই সকল মুণ্ড বংশদণ্ডে গ্রথিত করিয়া রাজধানীস্থ প্রকাশ্য রাস্তাগুলির পার্শ্বে স্থাপন করা হইয়াছিল। পরিশেষে এই সকল মুণ্ড বর্ত্তমান বাজরের উত্তর পার্শ্বস্থ ইষ্টক নির্ম্মিত পুলের নিম্নভাগে, কালাপাণিয়া ছড়ার গর্ত্তে প্রোথিত করা হইয়াছে। এই ঘটনা উপলক্ষে ত্রিপুরা জেলার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মেঙ্গল সাহেব স্বীয় রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন, -

"The heads of these (Jamatys) were cut off and are now hanging up in terrorison at Agartala."

বিদ্রোহের নেতা পরীক্ষিৎকে মহারাজ বীরচন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া ক্ষমা করিয়াছিলেন। ইহাদের উত্থান রাজদ্রোহিতা মূলক ছিল না, অত্যাচারীগণের বিরুদ্ধেই এই বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল, নেতাকে ক্ষমা করিবার ইহাই প্রধান কারণ।

অতঃপর মহারাজের অনুজ্ঞায় জমাতিয়াগণ উন্নত হিন্দু আচার গ্রহণ ও উপবীত ধারণ করিয়াছে। তদবধি এই সমাজের অনেকে মদ্য মাংস ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী

হইতেছে। ইহারা স্মরণাতীত কাল হইতে রাজভক্ত প্রজা, বর্ত্তমানকালেও সেই ভক্তির বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই। আজও জমাতিয়া সম্প্রদায় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের নাম উপাস্য দেবতার নামের সঙ্গে স্মরণ করিয়া থাকে।

এখন আর জমাতিয়াগণ ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে নাই, তাহারা শান্তভাব ধারণ করিয়া কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

নীলকৃষ্ণ বাহাদুরের মোকদ্দমা শেষ নিষ্পত্তির পর, মহারাজ বীরচন্দ্র ১২৭৯ ত্রিং ২৭শে ফাল্গুন (১৮৭০ খ্রীঃ ৯ই মার্চ্চ তারিখে) রাজ্যাভিষিক্ত হন। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট পক্ষে, চট্টগ্রামের তদানীন্তন কমিশনার লর্ড এইচ্, ইউলিক ব্রাউন সাহেব খেলাত লইয়া রাজধানীতে উপনীত হইয়াছিলেন।

মহারাজ বীরচন্দ্র ১৭৬১ শকের ১০ই আশ্বিন (১৮৩৯ খ্রীঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর) রজনীযোগে কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। রাজ্যাভিষেককালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর ছিল। অতএব তিনি পরিণত বয়সে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, একথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে সকল সময় বৃটিশ গবর্ণমেন্টের মত পোষণ করিয়া চলিতে পারিতেছিলেন না। এই সূত্রে অনেক সময় গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারীগণের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। সেকালের গর্বণমেন্ট ছিল পূর্ণমাত্রায় রক্ষণশীল এবং তাঁহাদের শাসননীতি দেশীয় রাজ্যসমূহ গ্রহণ করুক, ইহাই ছিল বৃটিশ রাজকর্ম্মচারীগণের একান্ত অভিপ্রেত। মহারাজ বীরচন্দ্র ছিলেন প্রাচ্য নীতির ঘোরতর পক্ষপাতী। বিশেষতঃ তাঁহার ক্ষমতার উপর অন্যে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে, তাহা নিতান্তই অসহনীয় হইত। সুতরাং উভয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে মতের সামঞ্জস্য ঘটিতেছিল না। সাম্রাজ্যাভিমানী বৃটিশ কর্ম্মচারীবর্গের সহিত জনৈক দেশীয় রাজার প্রতিনিয়ত বাক্‌বিতণ্ডা সেকালে যে নিতান্তই অশোভনীয় ছিল, মহারাজ বীরচন্দ্র সহজে সে কথা মানিয়া লইতে চাহিতেন না। কোন কোন স্থলে গবর্ণমেন্টের অনুরোধ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন, তাহা নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়া।

তাঁহার রাজত্বের সূত্রপাতেই 'Coronation' শব্দ লইয়া তর্ক উপস্থিত হয়। গবর্ণমেন্ট পক্ষের আপত্তিকারী বলিয়াছিলেন,- 'Crown' হইতে Coronation নামের উৎপত্তি। কাজেই British Crown এর নিম্নতম ব্যক্তি এই শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন না। তৎকালে সুরসিক মহারাজ বীরচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রদ্ধেয় কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর মহোদয়ের ভাষায় তাহা সুস্পষ্ট প্রস্ফুটিত হইয়াছে। উক্তঅংশ এ স্থলে

উদ্ধৃত হইল।

'বীরচন্দ্র রসিক ছিলেন, এবং জানিতেন রসিকতা ও রসের কথা। তিনি বলিয়াছিলেন, - আমি Crown রূপী তাজ মাথায় দেই না, কিন্তু মুকুট ধারণ করি- প্রজার জন্য। 'Throne' শব্দটা হিন্দুবাচক শব্দ নহে। আমি ছবি দেখিয়াছি এবং গল্প শুনিয়াছি, পুরাকালে যখন Europe প্রায় অসভ্য ছিল, তখন যে পাথরে Anglo-Saxon রাজগণ বসিয়া শাসন করিতেন, তাহা অদ্য পর্য্যন্ত 'Throne' নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছে। 'সিংহাসন' দেখিলেই মনে হইবে, সিংহমূর্ত্তিদ্বারা হইয়া পরিবেষ্টিত যে আসন প্রস্তুত হয়, তাহাই সিংহাসন। ইহা দেবতার আসন; দেবাসন ব্যতীত অন্য কোন আসনে হিন্দু রাজা বসেন না।"

দেশীয় রাজ্য-২য়খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা।

যে রাজ্য কাহারও অনুগ্রহ প্রদত্ত নহে- যে রাজ্য অন্য কোনও শক্তির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ নহে, সেই রাজ্যের রাজার পক্ষে এরূপ প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ কি ছিল, জানি না। মহারাজের উক্তি উত্থাপনকারীর প্রীতিপদ হইয়াছিল কিনা, তাহাও জানিবার প্রয়োজন নাই; ত্রিপুরেশ্বরগণের হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত রাজ্যাভিষেক পূর্ব্বাপরই চলিয়া আসিতেছে, এইমাত্র জানি; এবারও তাহাই হইয়াছিল।

সতীদাহ প্রথা ভারতবর্ষে স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। বৃটিশ শাসনকালে এই প্রথা রহিত জন্য কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। পরিশেষে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় দেশীয় গণ্য মান্য ব্যক্তির সাহায্যে ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক মহোদয় ১৮২৯ খ্রীঃ ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে প্রচারিত নিয়মদ্বারা এই প্রথা রহিত করেন। * এতদ্বারা বৃটিশ ভারতে ও দেশীয় রাজ্যসমূহে সতীদাহ প্রথা রহিত হইয়াছিল। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে ইহার পরেও সুদীর্ঘ ৬০ বৎসর কাল সতীদাহ অবাধে চলিয়াছে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি পতিত হয় এবং প্রথাটি রহিত করিবার নিমিত্ত বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট মহারাজকে অনুরোধ করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মহারাজ বীরচন্দ্র প্রাচ্য নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। সতীদাহ প্রথার অনুকূলে এবং প্রতিকূলে অনেক কথা থাকিলেও তিনি সে বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না, যে

---

* Regulation - XVII, 1829.

প্রাচীন প্রথা পবিত্র এবং পুণ্যজনক বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস। সেই প্রথা বন্ধ করিতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। এ বিষয় লইয়া অনেক লেখাপড়া হইবার পর মহারাজ দেখিলেন, বিষয়টা অনেকদূর গড়াইয়াছে। গবর্ণমেন্টের আগ্রহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। তখন তিনি প্রথাটা রহিত করাই সঙ্গত মনে করিলেন। এ জন্য তাঁহার আইন প্রণয়ন বা ব্যবস্থাপক সভা আহবান করিবার প্রয়োজন ঘটে নাই, একটি ক্ষুদ্র রোবকারী দ্বারাই কার্য্য সাধিত হইয়াছিল। উক্ত রোবকারী নিম্নে প্রদান করা হইল।

(Sd) B. C. Deb

রোবকারী স্বাধীন ত্রিপুরা, দরবার শ্রীশ্রীযুত
মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। সন
১২৯৯ ত্রিং, তাং ৮ই জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু জানা যায়, এ রাজ্যের পার্ব্বতীয় প্রদেশের কোন কোন স্থানে সতীদাহ অদ্যাপি সম্পূর্ণ রূপে লয় প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তাহা রহিত করা আবশ্যক। সেমতে-হুকুম হইল যে-

এতদ্দ্বারা উল্লেখিত সতীদাহ প্রথা রহিত করা যায় ও এই আদেশ প্রচারের তারিখের পর হইতে এই আদেশ লঙ্ঘন ক্রমে কোন কোন স্থানে উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, কি তাহার উদ্যেগ করা হইলে সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ দণ্ডনীয় হইবে। কার্য্যে পরিণত হওয়ার আদেশে এই রোবকারী রাজস্ব বিভাগে পাঠানো যায়।

(স্বাক্ষর) শ্রী প্যারীমোহন রায়,
মুন্সী।

এই প্রকারের অনেক কথা লইয়া গবর্ণমেন্টের সহিত মহারাজ বীরচন্দ্রের মতান্তর ঘটিয়াছে, এস্থলে তাহার সম্যক আলোচনা করিবার সুবিধা নাই।

মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের কুমার বলে মধ্যে জ্যেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র পরলোক গমন করায়, দ্বিতীয় পুত্র নবদ্বীপ বাহাদুরের আশা ছিল, মহারাজ বীরচন্দ্র তাঁহাকেই যৌবরাজ্য প্রদান করিবেন; এই বিশ্বাস সকলের হৃদয়ে পোষিত হইতেছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ অন্যরূপ দাঁড়াইল। মহারাজ বীরচন্দ্র ১২৮০ ত্রিপুরাব্দের ১৬ই ভাদ্র তারিখে স্বীয় জেষ্ঠ্য কুমার রাধাকিশোরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

অতঃপর নবদ্বীপ বাহাদুর বর্ষাধিক কাল আগরতলায় অবস্থান করেন। তৎপর স্বীয় জননীকে সহ ১২৮১ ত্রিপুরাব্দের আষাঢ় মাসে কুমিল্লা নগরীতে গমন করেন। কিয়ৎকাল পরে, তিনি চাকলা রোশনাবাদে উপর স্বত্ব স্থাপনের দাবীতে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। মহারাজ ঈশানচন্দ্র, বীরচন্দ্র মাণিক্যকে যুবরাজ নিয়োগ করেন নাই, সুতরাং পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী, কুমার নবদ্বীপ চন্দ্রের দাবি উত্থাপনের ইহাই প্রধান হেতু ছিল। মহারাজ বীরচন্দ্র বর্ণনায় জানাইলেন, স্বর্গীয় মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য তাঁহাকে যুবরাজের পদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং রাজ বংশের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে তিনিই সম্পত্তির অধিকারী ত্রিপুরার। জজ মিঃ ফাউল সাহেব, বীরচন্দ্রের যুবরাজী সনন্দ প্রবল গণ্য করিয়া তাঁহারই অনুকুলে মোকদ্দমা নিস্পত্তি করিলেন। কুমার নবদ্বীপ এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

১২৮৯ ত্রিপুরাব্দে কুমার নবদ্বীপ চন্দ্র আর এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। এই মোকদ্দমায় তিনি মহারাজ ঈশানচন্দ্রের সম্পাদিত পূর্বোক্ত রোবকারীর অনুসরণে চাকলা রোশনাবাদের উপর ভাবী স্বত্ব নির্দ্ধারণার্থ ও ভরণ পোষণ জন্য উপযুক্ত বৃত্তি লাভের প্রার্থী হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার তদানীন্তন জজ টাওয়ার সাহেবের ১২৮১ খ্রীঃ ২৪শে জানুয়ারী তারিখের বিচারে নবদ্বীপ বাহাদুরের মাসিক ৬০০ শত টাকা নির্দ্ধারিত হইল। এই আদেশের বিরুদ্ধে উভয় পক্ষই হাইকোর্টে আপীল উপস্থিত করিলেন। উক্ত আপীল উপলক্ষ্যে হাইকোর্টের বিচারপতিগণ স্থির করিলেন,- "ত্রিপুরাধিপতি একজন স্বাধীন নরপতি, তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ মোকদ্দমা বিচার অধিকার বৃটিশ আদালতের নাই।" এই হেতুতেই জজের বিচার পণ্ড হইল। কুমার নবদ্বীপ বাহাদুরের দাবী দাওয়া এইখানেই শেষ হইয়া গেল। পরিশেষে, বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের চিফ সেক্রেটারী মিঃ পিকক্ সাহেবের মধ্যবর্ত্তীতায়, কুমার নবদ্বীপ, ত্রিপুরেশ্বর হইতে মাসিক বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

কুমার বাহাদুর যখন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কুমিল্লায় চলিয়া যান, তৎকালে বাঙ্গালার লেপ্টেনেন্ট গভর্ণর, ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ অবস্থা অবগতার্থ ও দুর্দ্দান্ত লুসাই জাতিকে দমন করিবার জন্য ত্রিপুরায় পলিটিক্যাল এজেন্ট স্থাপনের সঙ্কল্প করিলেন। ১৮৭০ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে ভারত গভর্নমেন্ট, বাঙ্গলার শাসন কর্তার এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব অনুমোদন করায়, এ, ডব্লিউ, বি, পাওয়ার সাহেব ১৮৭১ খ্রীঃ ৩রা জুলাই তারিখে পলিটিক্যাল এজেন্ট পদে নিযুক্ত হইলেন। ইনিই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম

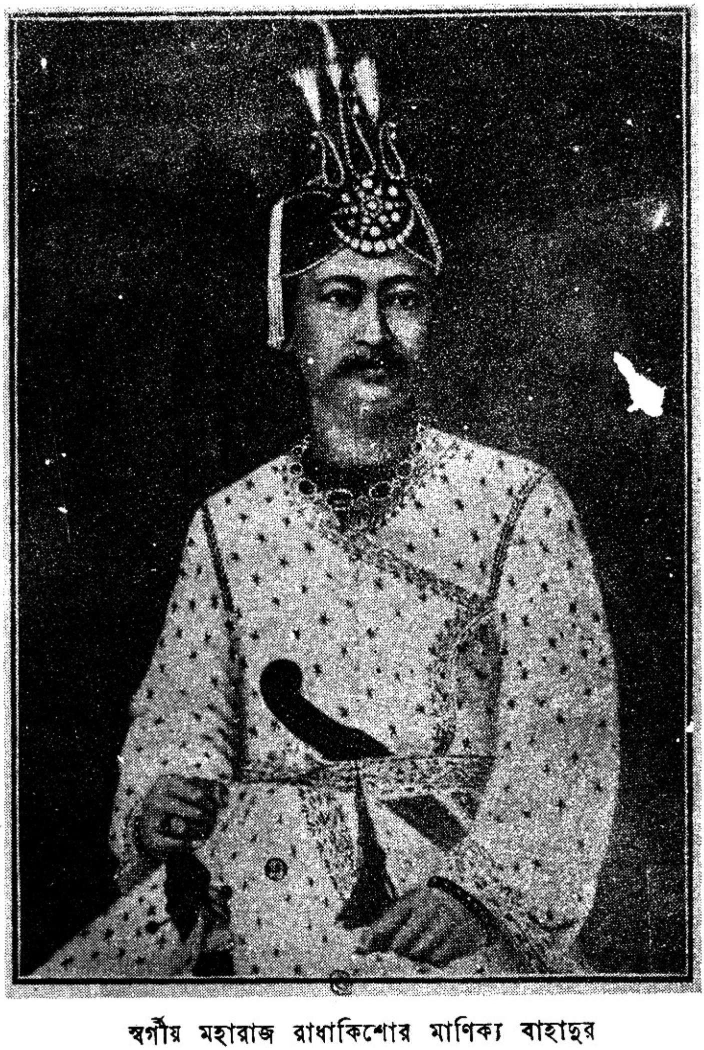

স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর

পলিটিক্যাল এজেন্ট। ইঁহার পরামর্শানুসারে মহারাজ বীরচন্দ্রকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজনীতি ক্ষেত্রে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের নিয়ম প্রণালী অনেক পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তদ্বিবরণ প্রাসঙ্গিকভাবে ক্রমশঃ প্রদান করা হইবে। তিনি বলিতেন - "ইংরেজী শাস্ত্রমতে রাজার স্বাধীনতা অর্থ পরের চর্ব্বিত খাদ্য গলাধঃকরণ করা। দাঁত পড়িলে নকল দাতের আবশ্যক হয়; আমার একটা দাঁতও পড়ে নাই, আমি কেন পরের চর্ব্বিত জিনিষ ভক্ষণ করিব ? " * কিন্তু তাহা বলিলে কি হইবে, তৎকালে তিনি যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, কর্ণেল সাহেবের ভাষায় তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। তিনি বলিয়াছেন, - "ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের গ্রহবৈগুন্যে এই 'Political Agent' গণ হইল Defacto Ruler। তাঁহারা প্রায় সমস্ত রাজ্যগুলিতেই একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কাজেই ত্রিপুরাতেও সেই রীতি ও নীতি যথাযথ প্রতিপালনের অদম্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। *

এই সময় রাজ্যের মন্ত্রী বা মন্ত্রী স্থানীয় প্রধান কর্ম্মচারীবৃন্দ মহারাজের অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। প্রধানতঃ এই কারণেই বারম্বার মন্ত্রী পরিবর্ত্তনের কারণ ঘটিতেছিল। কোন কোন স্থলে অন্য বিষয়ও পরোক্ষভাবে ইহার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মহারাজ বীরচন্দ্র প্রথমতঃ প্রভু গোস্বামীকে মন্ত্রী পদ হইতে অপসারণ করিয়া, ব্রজমোহন ঠাকুরকে তৎস্থলে নিয়োগ করিয়াছিলেন (১২৭৩ ত্রিপুরাব্দ)। ব্রজমোহন ঠাকুর প্রাচীন শাসন প্রনালী স্থিরতর রাখিয়া বিশেষ দৃঢ়তর সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন ইনি পাঁচ বৎসরের কিছু বেশীকাল মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পর শাসনভার মহারাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিজ তত্ত্বাবধানে ডব্লিও, এফ্, কেম্পবল নামক জনৈক ইংরেজের প্রতি কার্য্য পরিচালনের ভার অপর্ণ করেন। ইনি পূর্ব্বে জমিদারী বিভাগের ম্যানেজারের পদে কার্য্য করিয়াছেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের মধ্যে পরস্পর কলহ হেতু এবারের শাসন-পরিষদ অকৃতকার্য্য হওয়ায়, মহারাজ বীরচন্দ্র, কেম্পবল সাহেবকে জমিদারী বিভাগের ম্যানেজারের পদে পরিবর্ত্তিত করিয়া, নাজির দীনবন্ধু ঠাকুরকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করিলেন। অন্যান্য বিভাগে ঠাকুর বংশীয়দিগকে নিযুক্ত করা হইল।

---

* দেশীয় রাজ্য-২য় খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা।

* দেশীয় রাজ্য-২য় খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা।

এই সময়ে (১৮৭১ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে) দুর্দ্দান্ত কুকিদিগকে নির্য্যাতন করিবার নিমিত্ত কাছার ও পাৰ্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতে দুই দল বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। তৎকালে ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা নির্দ্ধারণ জন্যও চেষ্টা করা হয় , নানাকারণে সেই চেষ্টা বিফল হইয়াছিল । বর্ত্তমানকালেও এই সীমা লইয়া উভয় রাজ্যের মধ্যে তর্কের অবসান হয় নাই।

পূর্ব্বে এ রাজ্যে লিখিত আইন বা আধুনিক প্রণালীর আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল না। শাসনকর্ত্তাগণই আপন আপন বিবেক বুদ্ধি দ্বারা বিচার কার্য্য সম্পাদন করিতেন। শেষ আপীল শ্রবণ করিতেন স্বয়ং রাজ্যেশ্বর। এই সময় ত্রিপুরার বিচারাসন সত্যসত্যই ধর্ম্মাধিকরণ ছিল। আইনের পেঁচ, উকীলের কুটবুদ্ধি এবং কোর্ট ফি ও তলবানার বালাই এই অধিকরণে স্থান পাইত না। পাওয়ার সাহেব পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হইয়া আসিবার পর, তাঁহার পরামর্শানুসারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সংস্থাপিত হয়। আদালত প্রতিষ্ঠিত হইলে আইনেরও প্রয়োজন, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়ক আইন প্রচারিত হইল। ইহাই ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম লিখিত আইন।

প্রচীনকাল হইতে রাজেশ্বর স্বয়ং দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত শেষ আপীল গ্রহণ ও বিচার করিতেছিলেন। এই আপীল শ্রবণনর নিমিত্ত মহারাজ ১২৮২ ত্রিপুরাব্দের আষাঢ় মাসে এক স্বতন্ত্র আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা অনেক পরিমাণে প্রিভিকাউন্সিলের অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। এই আদালতের নাম দেওয়া হইয়াছিল, - 'খাস আপীল আদালত' দুইজন বিচারক এক যোগে আপীল শ্রবণ করিয়া, তাঁহদের রায় মহারাজ সদনে উপস্থিত করিতেন। এবং মহারাজ মঞ্জুর করিলে সেই রায় কার্য্যে পরিণত হইত।

এই সময় আবার প্রধান কর্ম্মচারীবর্গ স্বীয় স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, সুতরাং রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। দিন দিন ঋণভার বৃদ্ধি পাইতে চলিল। তখন মহারাজ বুঝিলেন, একজন অধিকতর যোগ্য কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। অল্পকাল মধ্যেই গভর্ণেমেন্ট সার্ভিস হইতে বাবু নীলমণি দাসকে ধার করিয়া আনা হইল। নীলমণি বাবু ১২৮৩ ত্রিপুরাব্দের ভাদ্র মাসে সম্পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করিয়া দেওয়ান পদে নিযুক্তহইলেন। মন্ত্রী দীনবন্ধু ঠাকুরকে সদর ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে পরিবর্ত্তন করা হইল।

নীলমনি বাবু বৃটিশ শাসন পদ্ধতির একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি প্রথমেই আবকারী বিভাগ সৃষ্টি, স্ট্যাম্প প্রচলন, দলিল রেজিষ্টারীর নিয়ম প্রবর্ত্তনাদি দ্বারা শাসন বিভাগ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত আইন সংশোধন ও ম্যাদ বিষয়ক আইন প্রণয়ন এবং মহারাজের মঞ্জুরী গ্রহণে রাজ্যে মধ্যে উহা প্রচার করেণ। এই সময় কারাগারের কার্য্য প্রণালীরও সংস্কার এবং ক্রমশঃ অন্যান্য বিষয়ক আইন প্রচারিত হইয়াছিল।

নীলমণি বাবুর পর, পুনর্ব্বার নাজির দীনবন্ধু ঠাকুরকে প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে এবং ডাক্তার শম্ভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সহকারী মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্ম্মণ বাবু দীননাথ সেন, রায় মোহনী মোহন বর্দ্ধন বাহাদুর ও রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর ক্রমান্বয়ে মন্ত্রীত্ব করিয়াছেন। পরিশেষে স্বর্গীয় রাধাকিশোর দেববর্ম্মণ যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর ও বড় ঠাকুর শ্রীলশ্রীযুত সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মণ বাহাদুর ভাগাভাগি রূপে মন্ত্রীপদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। মোহিনী বাবুর পরে, মহারাজের গঠিত 'অমাত্য সভা' দ্বারা কিয়ৎকাল শাসন কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল।

এস্থলে রাজনৈতিক বিবরণ অধিক আলোচনা করিবার সুবিধা নাই। স্থুলতঃ এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহারাজ বীরচন্দ্রের শাসনকালে ধীরে ধীরে রাজ্যটি বৃটিশ ছাঁচে ঢালাই হইয়া এক অভিনব আকার ধারণ করিল। আইন প্রণয়ন, আদালত প্রতিষ্ঠা, স্ট্যাম্প প্রচলন ইত্যাদি কার্য্যের দ্বারা শাসন ও বিচার বিভাগ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। এই সময় রাজ্য ও রাজ কার্য্যের উন্নতি বিধানার্থ যে সকল অনুষ্ঠান হইয়াছিল, বর্ত্তমানকালে তৎসমস্ত অধিকতর উন্নত ভাবে পরিচালিত হইতেছে। মহারাজের রাজনীতিক প্রতিভা সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে, এস্থলে তাহার সম্যক আলোচনা করা নিতান্তই অসম্ভব।

মহারাজ বীরচন্দ্র বিবিধ কলা-বিদ্যা বিশারদ ছিলেন; তন্মধ্যে সঙ্গীত কলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বয়ং সুগায়ক এবং বহুবিধ যন্ত্রে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। ভারতের তদানীন্তন সঙ্গীত শাস্ত্র পারদর্শী প্রধান ব্যক্তিগণের প্রায় সকলেই ত্রিপুরার রাজ দরবারে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভারত-বিশ্রুত রবাব বাদক (তানসেনের বংশ সম্ভূত) কাশেম আলী খাঁ, সুর-বীণ বাদক নিসার হুসেন, এস্‌রাজ বাদক হাইদর খাঁ, সেতার বাদক নবীনচাঁদ গোস্বামী, বেহালা বাদক হরিদাস, পাখোয়াজ বাদক কেশব মিত্র, পঞ্চানন মিত্র (পাঁচু বাবু) ও রাম কুমার বসাক, গায়ক ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী ও

যদুনাথ ভট্ট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা স্থায়ীভাবে নিযুক্ত ছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি যেমন সুগায়ক, তেমনি সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক দরবারী সঙ্গীত গায়ক সমাজে বর্তমানকালেও প্রচলিত আছে। গুণমুগ্ধ মহারাজ ইঁহাকে 'তানরাজ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। উপরি উক্তব্যক্তিগণ ব্যতীত আরও অনেক খ্যাতনামা গায়ক ও বাদক দরবারে গায়ক ও বাদক দরবারে সাময়িকভাবে আগমন করিতেন। তাঁহাদের নিমিত্ত বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারের পরে, ত্রিপুরা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সমগ্র ভারতের সঙ্গীত শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত মণ্ডলীর সমাবেশের কথা শুনা যায় না।

রাজার অনুকরণে রাজ পরিবার ও প্রজা সাধারণের ধর্ম্ম। এই সময় রাজনিকেতনে, এবং রাজধানীস্থ ধনী, দরিদ্র, ভদ্র, ইতর সকলেরই গৃহে সঙ্গীত চর্চ্চা হইতেছিল। তাহার সুফল বর্ত্তমান কালেও কিয়ৎ পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একমাত্র মহারাজের সঙ্গীত রসজ্ঞতার শুভফল বলা যাইতে পারে।

চিত্র কলায় মহারাজের অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। জলরং চিত্র (Water clour painting), তৈল রং চিত্র (Oil painting) এবং আলোক চিত্র (Photograph) লইয়া তিনি জীবনের অধিকাংশকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। কতিপয় দেশীয় ও ইয়ুরোপীয় সুনিপুণ চিত্র-শিল্পী দরবারে স্থায়ী রূপে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজের এই কার্য্যের ফলও রাজপরিবারের মধ্যে প্রসারিত হইয়াছিল। চিত্রের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম এবং তাহার দোষ গুণ যথাযথ বিচার করিবার ক্ষমতা আগরতলাবাসী প্রায় সকল লোকেরই আছে। মহারাজের অভিপ্রায়ানুসারে প্রতি বৎসর রাজপ্রাসাদে চিত্র প্রদর্শনী হইত। সাধারণের চিত্র-কলায় উৎসাহ বৃদ্ধি করাই এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ছিল। রাজ পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি প্রদর্শনীতে চিত্র বা ফটো উপস্থিত না করিলে মহারাজ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইতেন।

মহারাজ কেবল সঙ্গীত ও চিত্র-কলায় পারদর্শী ছিলেন, এমন নহে। তিনি আরও বহু গুণান্বিত ছিলেন, এস্থলে তৎসমস্তের উল্লেখ করা অসম্ভব। তাঁহার কবিত্ব প্রতিভা এবং সাহিত্য সেবা সম্বন্ধীয় কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য মনে হইতেছে, বঙ্গ ভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগের কথাও উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গ ভাষার উন্নতি ও পুষ্টি বিধান, ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের চির প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি।

মহারাজ বীরচন্দ্র সেই সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি রক্ষার নিমিত্ত অসাধারণ যত্ন করিয়াছেন। স্মরণাতীত কাল হইতে ত্রিপুরার রাজ কার্য্যে বঙ্গ ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মহারাজ বীরচন্দ্রের শাসনকালে ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া, ইংরেজী ভাষার ব্যবহার আরম্ভ করেন। মহারাজ দেখিলেন, রাজ্যের চিরপ্রচলিত একটি নিয়ম, কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে, বিশেষতঃ তদ্দরুণ বঙ্গ ভাষা পোষণের সদুদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইতেছে। এই অনভিপ্রেত কার্য্যে নিবারণকল্পে তিনি ১২৮৪ ত্রিপুরাব্দে এক আইন প্রচলন করেন। বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থল ব্যতীত রাজ কার্য্যে বঙ্গভাষা ভিন্ন অন্য ভাষার প্রয়োগ নিবারণ করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। অতঃপর স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য ও স্বর্গীয় মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের শাসন কালেও সময় সময় উপরিউক্ত মর্ম্মের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। এই কার্য্যের দ্বারা মহারাজগণের বঙ্গভাষার প্রতি অসাধারণ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

কেবল রাজ কার্য্যে বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার দেখিয়াই মহারাজ তৃপ্ত ছিলেন না। তিনি বঙ্গ ভাষার একনিষ্ঠ সেবক এবং সুকবি ছিলেন। সাহিত্য সেবায় তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে কালের দীণা-ক্ষীণা বঙ্গভাষাকে তিনি বহুবিধ মূলবান রত্নে অলঙ্কৃতা করিয়াছেন। বিবিধ প্রকারের প্রচিন গ্রন্থ এবং সৎগ্রন্থ মুদ্রণের ব্যয় বহন দ্বারা ভাষার বিস্তর উন্নতি বিধান এবং গ্রন্থকারদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

বৈষ্ণব মহাজন শ্রীশ্রীঘনশ্যাম দাস (নরহরি চক্রবর্ত্তী) কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'গীত চন্দ্রোদয়' নামক পদাবলী গ্রন্থ বর্ত্তমান কালে নিতান্তই দুর্ল্লভ হইয়াছে; অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থ নাই, এবং ইহা অনেক খ্যাতনামা প্রবীণ সাহিত্যিকের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। মহারাজ বীরচন্দ্র, রাজভাণ্ডারে রক্ষিত উক্ত গ্রন্থের হস্তলিখিত আদর্শ অবলম্বন করিয়া স্বয়ং তাহার সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রযত্নে 'অষ্টকাল - রাগানুরাগ' খণ্ড মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। রয়েল ১২ পৃষ্ঠা ফর্ম্মার ৩৮৮ পৃষ্ঠায় এই খণ্ড শেষ হইয়াছে। দুঃখের কথা, তিনি অবশিষ্টাংশ প্রচার করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্যরত্ন, এই কারণেই সাহিত্য রত্নের জহুরী, আগ্রহের সহিত স্বয়ং ইহার প্রচার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

কতিপয় টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রচার ও তাহা বিনামূল্যে

বিতরণ কার্য্য মহারাজ বাহাদুরের এক অম্লান কীর্ত্তি। বৈষ্ণব পণ্ডিত স্বর্গীয় রাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক বহরমপুর হইতে এই বিরাট গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছিল। রাজভাণ্ডারের অর্থে, উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা আরো অনেক মূল্যবান বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল। এই সকল কার্য্যে দ্বারা যেমন ভক্ত সমাজের উপকার হইয়াছে, তেমনি সাহিত্যের পুষ্টি সাধন হইয়াছে।

মহারাজ শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, এবং তদর্থে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তিনি বাল্যকালে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই, তজ্জন্যে শেষ জীবনেও আক্ষেপ করিয়াছেন। তৎকালোচিত নিয়মে মহারাজ বাঙ্গলা ও উর্দ্দূ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সংস্কৃত এবং ইংরেজী ভাষায়ও কথঞ্চিত অধিকার ছিল। তিনি মণিপুরী, ত্রিপুরা এবং উর্দ্দূ ভাষায় মাতৃভাষার ন্যায় অনায়াসে আলাপাদি করিতে পারিতেন। তাঁহার সময়ে রাজধানীতে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সন্তানগণের শিক্ষা বিষয়ে মহারাজের বিশেষ যত্ন ছিল। তাঁহাদিগকে ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও উর্দ্দূ ভাষায় শিক্ষাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চিত্র, শিল্প, সঙ্গীত এবং কবিতা রচনা শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন। এই সকল কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে মহারাজ কখনও কুন্ঠিত হন নাই। কুমারগণের সাহিত্য-চর্চ্চার নিমিত্ত একটি সভা স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহাদের রচিত প্রবন্ধ ও কবিতাএই সভায় পঠিত ও আলোচিত হইত। মহারাজ কোন কোন সময় কুমারগণকে বলিতেন- " আমরা শিক্ষা জীবনে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিয়াছি। বাঙ্গলা ভাষা শিখিতে, বটতলার ছাপা শিশুবোধক, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত এবং শনি এবং সত্য নারায়ণের পাঁচালী ব্যতীত অন্য কোন পুস্তক আমরা পায় নাই। পঞ্জিকার ছবি এবং কালীঘাটের আঁকা পটই চিত্রের চরম আদর্শ ছিল। বর্ত্তমানকালে তোমরা নানাবিধ উপাদেয় গ্রন্থ এবং চিত্রের অসংখ্য মূল্যবান আদর্শ পাইতেছ। তোমাদের শিক্ষাবিধানের নিমিত্ত যত্নও কম করা হইতেছে না। এরূপ সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াও যদি তোমরা শিক্ষালাভে বঞ্চিত হও, সেই দোষ তোমাদের-অভিবাবক বা সময়ের দোষ দিতে পারিবা না। " কুমারীগণের শিক্ষালাভের বিষয়েও মহারাজ যত্নের ত্রুটি করেন নাই। আনন্দের কথা এই যে, মহারাজের প্রায় সমস্ত গুণই কুমার এবং কুমারীগণের মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হইতে দেখা গিয়াছে। রাজপরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণও সেইসকল গুণের অংশ লাভে বঞ্চিত হন নাই।

স্বর্গীয় বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুর

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মহারাজ বীরচন্দ্র সুকবি ছিলেন। যশের প্রত্যাশী ছিলেন না বলিয়াই তাঁহার সুমধুর কবিতাগুলি জন সমাজে প্রচারিত হয় নাই। তিনি স্বরচিত কবিতাগুলি কৃপণের ধনের ন্যায় সঙ্গোপনে রক্ষা করিতেন। মহারাজের খাস মুদ্রা যন্ত্রে অল্পসংখ্যক গ্রন্থ মুদ্রিত হইত, মুদ্রণকালে যন্ত্রালয়ে কাহারও প্রবেশাধিকার থাকিত না। গ্রন্থগুলি বিবিধ বর্ণের কালিতে পরিপাটীর সহিত মুদ্রিত এবং উত্তম বাঁধাই হইত। কিন্তু তাহা একান্ত অন্তরঙ্গ ও অনুগৃহীত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ পাইতেন না। এতৎ সম্বন্ধে পরলোকগত কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন; -

"মহারাজ বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তিনি একজন সুকবি। তৎপ্রণীত দুইখানা কবিতা পুস্তক আমরা দর্শন করিয়াছি। ***

তাহাদের ভাব সরল, মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহার সমস্ত গীতি কবিতাই প্রেমের কাকলীপূর্ণ ও মধ্যে মধ্যে দর্শনাত্মক ভাবের ছায়াপাতে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল সুন্দর কবিতা কুসুমের সৌরভ আগরতলার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কদাচিৎ কাহাকেও আকুলিত করিয়া থাকে। সেগুলি প্রকাশ করিতে মহারাজ নিতান্ত অনিচ্ছুক। কিন্তু প্রকাশিত হইলে তিনি বঙ্গীয় কবি সমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইতেন সন্দেহ নাই।"

কৈলাশ বাবুর রাজমালা - ২য় ভাগ, ১৭শ অঃ

ইহা মহারাজের জীবিতকালের কথা। তাঁহার দেহ রক্ষার পর, তদীয় পুত্র স্বর্গীয় মহারাজ কুমার বিমলচন্দ্র দেববর্মণ স্বরচিত 'গোপ-বালা' খণ্ড কাব্যের উৎসর্গ পত্রে পিতা মহারাজের উদ্দেশ্যে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে মহারাজের কবিত্ব গোপন রাখিবার স্পৃহা স্পষ্টতরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কুমার বিমলচন্দ্রের বাক্যে এই; -

"এনেছিলে বাণী হ তে-
অমর বাঞ্ছিত ধন
কবিত্বের বীণা;
একাকী বিরলে বসি
বাজাইয়া মনোসাধে,
ভুলিতে আপনা॥

মধুর ঝঙ্কার তার,
শুনিবার যোগ্য নহে
মরতের জীব;
তাই সঙ্গোপনে বুঝি
নিয়ে গেলে সঙ্গে করি
মোহিতে ত্রিদিব; ইত্যাদি।

মহারাজ কবিতার ন্যায় গানগুলির সঙ্গোপনে রাখিতে পারেন নাই। তাহা নিজে পড়িয়া, নিজে গাহিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেন না, তাই সুগায়কদিগকে প্রদান করিতে বাধ্য হইতেন। সেই সকল সঙ্গীত সৰ্ব্বদা কীৰ্ত্তনে ও মজলিসে গীত হইত, তৰ্দ্ধেতু তাহার বহুল প্রচার হইয়াছিল। এস্থলে দুই একটি সঙ্গীত দ্বারা মহারাজের কবিত্বের প্রথম পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে। তিনি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন, ভক্ত বৈষ্ণবজনোচিত অনেক সুললিত গান রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত শ্রীরাধিকার রূপ বর্ণনার গীতটি সাহিত্যামোদিগণকে সাদরে উপহার প্রদান করা যাইতেছে।

জয় জয়ন্তী-ঝাপ।

জয় জগত বন্দিনী,
হরি হৃদয়-রঞ্জিনী,
ব্রজ-রমণী-মুকুট-মণি-রাধিকে শ্রীরাধিকে।
ঘন জঘন শোহিনী,
গজহু বর গামিনী,
চরণ-রুচি-তরুণ অরুণাধিকে শ্রীরাধিকে॥
মৃদু মধুর হাসিনী,
রসময় সুভাষিণী,
বদন কত ইন্দু-শত-নিন্দিতে শ্রীরাধিকে।
শ্যাম মনোমোহিনী
কান্তি জিনি দামিনী,
রসিক ব্রজনাগর বিমোহিতে শ্রীরাধিকে॥
সরস রস রঙ্গিনী,

নীধু বন বিলাসিনী
শ্যাম সুখ-সাধ সব সাধিকে শ্রীরাধিকে।
চটুলতর চাহনী,
মদন-মুরছায়নী,
ঘন-বরণ হৃদয়-মণি-মালিকে শ্রীরাধিকে॥
শ্যাম-পট পিঁধনে
শ্যাম-চিত বন্ধনে,
শ্যাম ঘন অঞ্জনহি লোচনে শ্রীরাধিকে।
জয় কৃষ্ণ ভামিনী,
জয় কৃষ্ণ শোহিনী,
রটহুঁ বীর চন্দ্র নীতি আননে শ্রীরাধিকে॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনাও সুন্দর হইয়াছে, আমরা তাহা দেখাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। গানটি এই;-

জয় জয়ন্তী-ঝাপ।

নীল নব জলদ-রুচি রুচি রুচির সুন্দর,
পীত-ধটি কটি তটে সুসাজে।
মুকুট পরি খচিত শিখি পুচ্ছে নব-মল্লিকা
বক্ষে বনমালা বিরাজে॥
অধর 'পর বেণু তঁহি মিলিত মুখ মোদনে
মধু মধু মধুর মোহ তানে।
শুনহি পশু পাখীকুল শাখীকুল পুলকিত,
তপন তনয়া বহ উজানে॥
শ্রবণযোগে মণি-মকর গণ্ডে করু ঝল মল,
মেহ'পর বিজরী যনু হাসে
সহজে দৃক্-অঞ্চল জিনিয়া সরসীরুহ-
তাহে কত কুসুম-শর ভাসে॥
কেলী কদমকি তলে সুললিত ত্রিভঙ্গিয়া,

নব-অরুণ চরণ-অরবিন্দ।
গোকুল কুল রমনীক মনসিজ সুমুর্ত্তিময়;
পেখব কি ললিত অতি মন্দ ॥ **

এই দুইটি পদ যে কোন উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদামৃতের সহিত মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ভাবমাধুর্য্যের এবং শব্দ সম্পদে পদ দুইটি অতুলনীয় হইয়াছে। যিনি একবার মাত্র আগরতলার কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, সুগায়ক কর্ত্তৃক গীত হইলে, এই গান দুইটি ভক্ত হৃদয়ের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে।

এই প্রকারের আরও অনেক বৈষ্ণব পদাবলী মহারাজ বীরচন্দ্র কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, তাহার সম্যক উদ্ধার করা দুষ্কর; যাহা পাওয়া গিয়াছে; এ স্থলে তাহারও সম্যক সন্নিবেশ সম্ভবপর নহে।

আমরা এ পর্য্যন্ত মহারাজের রচিত ছয় খানা কবিতা পুস্তক পাইয়াছি, তাহার দুইখানা বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্মত গীতাবলী-একখানা 'হোরি' ও অন্য খানা 'ঝুলন'। এই পুস্তিকাদ্বয়ে সন্নিবেশিত সুললিত গানগুলি বৈষ্ণব পর্ব্বোপলক্ষে রাজ অন্তঃপুরে মহিলাগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে। বাহিরেও এই সকল গানের যথেষ্ট প্রচলন আছে; মণিপুরী সমাজে ইহার আদর অত্যন্ত বেশী। অবশিষ্ট বহিগুলি প্রায় সমস্তই কবির আত্ম জীবনের সুখ-দুঃখের আবেশময়ী কাকলী। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই সকল গ্রন্থের বিশদ আলোচনা করা অসম্ভব, এস্থলে সামন্য পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে।

হোরি;- ইহা শ্রীশ্রীদোল পূর্ণিমা উপলক্ষে বিরচিত গীতি কাব্য। এই পুস্তিকায় দোল-লীলার শাস্ত্রোক্ত শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া, হোরি উৎসবের চৌত্রিশটী গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; তাহার একটি মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

রসে ডগমগ ধনী আধ আধ হেরি,
আচল সঞে ফাগু লেই কুঁয়রি।
হাসি হাসি রসবতী মদন তরঙ্গে,
দেয়ল আবির রসময় অঙ্গে।
চতুর নাহ হৃদয়ে ধরু প্যারী,

---

* মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের অন্য নাম ছিল ললিতচন্দ্র।

মুচকি মুচকি হাসি হেরত গোরী।
দেওত ফাগু নাহ লোচন-যোড়,
মুদল ধনী দুহুঁ নয়ন-চকোর ;
ইহ অবসরে কত চুম্বই কোণ,
বীরচন্দ্র রচ দুহুঁ রস গান ॥”

পুস্তকের সমগ্র ভাগ এবম্বিধ দোল-লীলামৃত বর্ণনায় পরিপূর্ণ। একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া ইহার মাধুর্য্য বুঝাইতে চেষ্টাকরা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু উপায় বিহীন অবস্থায় ইহা অবস্থায় ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

ঝুলন;- এই পুস্তিকায় পঞ্চাশটি ঝুলনগীতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রাজমহিষী স্বর্গীয়া ভানুমতী মহাদেবীর উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানা উপহার দিয়াছেন। ইহা কবির “শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তি দায়ক” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মহারাণীর পরলোক গমনের অল্পকাল পরে ইহা রচিত হইয়াছিল। শোক বিহ্বল কবি নিম্নোক্ত শেষ প্রার্থনা গাহিয়া সমাপ্ত করিয়াছেন;-

“পাঁজরে বিষের জ্বালা, হিয়ায় অনল হে-
ঝলকে ঝলকে উঠে জ্বলে,
উঠিতে পড়িয়া যাই পদ মোর বাঁধা নাথ
বিষয়ের বিষম শিকলে।
কাটি এ করম ডোর বজরের বাঁধ হে-
বীরচন্দ্র দাসের রাখোপায়,
যেকদিন বাঁচি আর শ্রীবৃন্দা-বিপিনে নাথ,
থাকি যেন যুগল সেবায় ॥”

ইহা নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবের অন্তর্নিহিত কামনা। মহিষীর বিরহ কাতর বৈষ্ণব কবি শ্রীভগবানের পাদ পদ্মে সংসার পাশ ছেদন ও সেবাধিকার পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন।

এই পুস্তিকার মাধুর্য্য বলিয়া বুঝাইবার নহে-উপভোগ করা আবশ্যক। ইহাতে

সন্নিবেশিত আরো একটি গান এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে -

বিনোদ হিল্লোলে বিনোদ নাগর
বিনোদিনী সহ ঝুলে,
চারিদিগে মিলি বিনোদিনী দল
নাচয়ে বিনোদ তালে।
বিনোদ বিনোদ বাজিছে নুপুর
ঝুনু রুণু রুণু নাদে,
মুরজ মুরলী বীণা মুরচঙ্গ
বাইছে প্রমোদ মদে।
তা কৃতি তা কৃতি কৃতি থৈ থৈ
মধুর মুরজ বলে,
মন্থর গতি পদকি চাল
সঘন মঞ্জির রোলে।
গাইছে কিশোরী মুরলীর সহ
মিলায়ে মধুর স্বর,
মুরলী থুইয়া, চিবুক ধরিয়া,
চুম্বয়ে নাগর বর।
কমলে মধুপ যৈছন শোভত,
দুহুঁ মুখ শোভা তায়,
পরাণ ভরিয়া দাস বীরচন্দ্র,
ওরস মাধুরী গায়॥"

প্রেম-মরিচিকা; -মহারাণী ভানুমতী মহাদেবীর স্বর্গারোহণের পর কবির বিরহ কাতর হৃদয়ে যে শোকোচ্ছাস উচ্ছসিত হইয়াছিল, তাহাই কবিতা রূপে স্ফূরিত হইয়া এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কবি ব্যকুল অন্তরে গাহিয়াছেন; -

"সে মধু বাতাসে যেন উঠিছে বাজিয়া
জীবনের নিদ্রিত বাঁশীটি;
আজি ভালবাসা যেন সাথীহারা পাখি,

কাঁদিছে গাহিঝে একেলাটি !
রয়ে রয়ে এখনো কি উঠিস্ রে' ডেকে-
সারা দিবে কেবা আর আছে ?
যাছিল সকলি গেছে এবে একা আমি,
কেন রে আসিস মোর কাছে ?"

গ্রন্থের সমগ্র ভাগে এমনিইতর মর্ম্মবেদনার উষ্ণ শ্বাস অনুভূত হইবে। বিরহ বেদনার শোক-গাথা ব্যতীত ইহাতে আর কিছু নাই। কিন্তু শোক-গীতি হইলেও মাঝে মাঝে কবিত্বের মাধুর্য্য পাওয়া যায়। প্রভাত বর্ণন করিতে যাইয়া কবি বলিয়াছেন;-

"শোভিল অটবি, শোভিল মাধবী,
কুসুম ভূষণ পরা;
উঠিল মালতী ছাড়িয়া শয়ন,
কুয়াশার জলে পাখালি নয়ন,
অলি যেন তায় কাজল ভরা;

এই গ্রন্থের প্রকৃত পরিচয় প্রদানযোগ্য স্থানাভাব, সুতরাং ক্ষুব্ধ চিত্তে নিরস্ত থাকিতে হইল।

ইহার পর কবির সন্তপ্ত জীবনের বিরাম দায়িনী আর এক নূতন যবনিকা উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। তুষারজাল সমাচ্ছন্ন শ্রীভ্রষ্ট বিটপী দল বসন্ত সমাগমে যেন নব-মুকুল সম্পদে সুশোভিত হয়, তদরূপ মহারাজের শোকদীর্ণ হৃদয় স্বর্গীয়া মহারাণী মনোমোহিনী মহাদেবীর সংস্পর্শে আবার নুতন স্ফূর্তি লাভ করিয়াছিল। নিদাঘ তপ্ত মরুভূমি আবার নন্দন কাননের শোভা ধারণ করিয়াছিল। কবির এই সময়ের রচিত তিন খানা গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। এ স্থলে তাহার স্থূল বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে।

উচ্ছ্বাস; - ইহা উচ্ছ্বসিত প্রেমের হৃদয়ের মধুর হিল্লোল, নবাগতা মহারানীর উপহারের নিমিত্ত রচিত হইয়াছিল। এই সময় কবির হৃদয় সুখ-দুঃখের সংমিশ্রণন অভিনব ভাব ধারণ করিয়াছিল। নব মহিষীর প্রতি কবি যাহা বলিয়াছেন ,তদ্দ্বারাই তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে;-

"সখীরে,-
উঠিছে পড়িছে আজি কত
দুঃখের সুখের কথা হৃদয়ে নিভৃতে মোর
আধো আধো আব্ ছায়া মত !
আধো দুখে আধ সুখ ছিল আবরিয়া
কি যেন মেঘের কোলে জোছনা রাখিয়া।"

* * * *

"সুখে দুখ গিয়াছে ডুবিয়া,
দুঃখের হৃদয়ে আজি, নেশার আধেক ঘোরে
রহিয়ছে কি সুখ ছাইয়া !
নয়নে ভাসিছে কত সুখের স্বপন,
পাইয়া তোমার সেই সুখ সম্মিলন ! " ইত্যাদি।

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ পটে বিদ্যাপতির-"আজি মঝু গেহ গেহ করি মাননু" পদটি 'মটো' করা হইয়াছে; ইহা আলোচনা করিলেও বুঝা যায়, মহারাজ দীর্ঘকাল অশান্তি ভোগের পর আবার শান্তির সাহচর্য্য লাভ করিয়াছেন। গ্রন্থের সমগ্র ভাগ এবম্বিধ ভাব ব্যঞ্জক কবিতাবলীতে পূর্ণ রহিয়াছে।

অকাল-কুসুম;-ইহা প্রেমিক কবির হৃদয়োত্থিত প্রেম উৎসে পরিপূর্ণ। ইহাও মহারাণী মনোমোহিনী মহাদেবীর কথা লইয়াই রচিত এবং তাঁহাকেই উপহৃত হইয়াছে। উপহার পত্রে কবি বলিয়াছেন;-

"প্রেয়সিরে,-
গেঁথেছি তোমার লাগি বিরলে বসিয়া আমি
যে সাধের মালা,
উজল মাণিক নহে- নহে যুঁই-নহে বেলী
রূপ গন্ধে নাহি করে আলা।"

ইহার পর কবি যেন ভুল ভাঙ্গার সুরে বলিয়াছেন,-

"ভালমন্দ নাহি জানি, গাথিঁয়া পেয়েছি সুখ,

রূপে গুণে তোমারি মতন,
তাই এত করেছি যতন।”

এই গ্রন্থ প্রেমের কাকলীতে পরিপূর্ণ, স্থানাভাবে তাহা দেখাইবার সুবিধা ঘটিল না।

সোহাগ;-ইহাও উক্তমহারাণীকে উপলক্ষ করিয়া রচিত, তাঁহাকেই উপহার দেওয়া হইয়াছে।

প্রেমিক কবি নবীন প্রেমের স্বরূপ-অল্প কথায় স্পষ্টতর ভাবে ফুটাইতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি বলেন,-

“মানবের নব প্রথম পিরীতি
তরুণ নূতন কুসুম মত,
চিরকাল মনে রহে জাগরিত,
পরের পিরীতি রহে না তত।
সেই সুধাময় নবীন পিরীতি
জনম নবীন যৌবন সনে;
তাই চিরদিন পিরীতি মুরতি
দেবতার মতো জাগয়ে মনে।”

ভুক্ত ভোগী ভাবুক কবির উদ্ধৃত কবিতা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, নুতন রাজমহিষীর প্রযত্নে তাঁহার হৃদয়ের ক্ষত প্রলেপ লিপ্ত হইলেও তদ্দ্বারা যৌবন লব্ধ নবীন প্রেমের প্রথমচ্ছটা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। আরাধ্য দেবতার ন্যায় সেই পবিত্র প্রেম-স্মৃতি সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক ছিল।

এই গ্রন্থের সন্নিবেশিত প্রেমোচ্ছ্বাস পূর্ণ কবিতাগুলি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা আলোচনা করিবার সুবিধা ঘটিল না।

এতদ্ব্যতীত মহারাজের রচিত আরো কয়েকখানি গ্রন্থ এবং অনেক কবিতা ছিল, তাহা এখন নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার যে সকল গ্রন্থ ও সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে, প্রবন্ধ বিস্তৃতি ভয়ে তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরভাবে আলোচিত হইল। সম্যক আলোচনা

করিতে গেলে, স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়, এ স্থলে তৃপ্তির সহিত আলোচনা করা সম্ভবপর নহে।

মহারাজ বীরচন্দ্রের কবিতা প্রতিভা সকলেরই অনুকরণীয় হইয়াছিল। রাজ পরিবারের কুমার কুমারীগণ, ঠাকুর পরিবারস্থ ব্যক্তিবৃন্দ এবং রাজধানীবাসী অনেকেই সেকালে বঙ্গ-বাণীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। এমনকি, অসভ্য কুকি সমাজেও কবিতা রচনার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছিল; কুকিরাজ বাণখাম্পুইর রচিত কবিতাই একথার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

মহারাজ কবিদিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন এবং পোষণ করিতেন। তাঁহার দরবার অনেক কবি স্থান লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাজ কবি স্বর্গীয় মদন মোহন মিত্র মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

মহারাজ বীরচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনায় তাঁহার ভবিষ্যতের প্রতিভা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে কবি সম্বর্দ্ধনা করেন। এ সম্বন্ধে কবিবর নিজের ভাষায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই সম্যক অবস্থা অবগত হওয়া যাইবে। কবি সম্রাটের বাণী :-

"এই ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে আমার যে প্রথম পরিচয়, তা খুব অল্প বয়সে। সদ্য England থেকে, ফিরে এসেছি; তখন একখানি মাত্র কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। বাল্যের রচনা, অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি অনেক ত্রুটি থাকায়, পুনঃপ্রকাশিত হয় নাই।

সেই সময়ে আমাকে এবং আমার লেখা সম্বন্ধে খুব অল্প লোকেই জানতেন। আমার পরিচয় তখন কেবল আমার আত্মীয় স্বজন নিকটতম বন্ধুজনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একদিন, এই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দূত আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। বালক আমি, সসঙ্কোচে আমি তাঁ'কে অভ্যর্থনা করলাম। আপনারা হয়তো অনেকেই দূত মহাশয়ের নাম জানেন- তিনি রাধা রমণ ঘোষ মহারাজ তাঁকে সুদুর ত্রিপুরা হ'তে বিশেষভাবে পাঠিয়েছিলেন, কেবল জানাতে যে, আমাকে তিনি কবি রূপে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছা করেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বালক কবির বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

এরপর থেকে নানা সময়ে নানা উপদেশ এবং বিশেষ করে 'রাজর্ষি' লিখিবার সময়ে 'রাজমালা' থেকে সংস্কৃত বিষয়গুলি ছাপিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তার থেকে আমি গোবিন্দ মাণিক্যের প্রকৃত ইতিবৃত্ত জানতে পেরেছিলুম।

তিনি কার্সিয়াং এ যাবার সময় আমাকে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ

করলেন। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় তিনি আমার লেখা শুনতেন আর গান গাইতে বলতেন। তাঁর স্নেহ, আদর আমার প্রাণে স্থায়ী রেখা টেনে গেছে।

মহারাজ বীরচন্দ্র অসাধারণ সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। তাঁর কাছে আমার মত অনভিজ্ঞের গান গাওয়া যে কতদূর সঙ্কোচের ছিল তা' সহজেই অনুমেয়। কেবল মাত্র তাঁর স্নেহের প্রশ্রয়ে আমাকে সাহস দিয়েছিল।

তিনি যে আমার কাছে আবৃত্তি ও সঙ্গীত আলাপ শুনেই আমাকে রেহাই দিতেন তা নয়; তিনি তাঁর বিষয় কর্ম্মেও আমার শক্তিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন।

জীবনে যে যশ আজ আমি পাচ্ছি, পৃথিবীর মধ্যে তিনিই তার' প্রথম সূচনা করে দিয়েছিলেন, তার অভিনন্দনের দ্বারা। তিনি আমার অপরিনত আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পেয়েই তখনই আমাকে কবি সম্বোধনে সম্মানিত করেছিলেন। যিনি উপরে শিখরে থাকেন, তিনি যেমন যা সহজে চোখে পড়ে না তা'কেও দেখতে পান, বীরচন্দ্রও তেমনি সেদিন আমার মধ্যে অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে যখন আমি তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছিলেম, সেই সময় তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে নানারকম আলাপ হতো। বৈষ্ণব পদাবলীর যথা সম্ভব সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ ও প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে এক লক্ষ্য টাকা ব্যয় করবার সঙ্কল্প তাঁর ছিল। কিন্তু তরপরই তাঁর সহসা মৃত্যু হওয়াতে সে সঙ্কল্প সফল হতে পারেনি।

মহারাজ বীরচন্দ্র কবি ছিলেন, এবং কাব্য ও কবিতার রসাস্বাদনে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল; তিনি একদিন কাব্যেরষিক সুযোগ্য পার্শ্বচরগণের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদনের গ্রন্থ সম্বন্ধে যে সারগর্ভ সমালোচনা করিয়াছিলেন, মহারাজ কুমার স্বর্গীয় নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মণ বাহাদুরের লেখায় তাহা উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিফলিত হইয়াছে। এস্থলে তাহা প্রদান করিতে না পারিয়া আমরা দুঃখিত আছি। সুযোগ পাইলে সময়ান্তরে এবিষয় আলোচিত হইবে।

মহারাজ বীরচন্দ্র সর্ব্বগুণান্বিত রাজা ছিলেন। তাঁহার দানের কথা ভারত

বিশ্রুত; এই মহাপুরুষের দয়ায় কত লোক যে কত ভাবে উপকৃত ও ধন্য হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইঁনি বিশেষ সুখ্যাতির সহিত ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্যের যে সকল উন্নতি ঘটিয়াছিল, তাহার আভাস পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে।

মহারাজ বীরচন্দ্র ১৩০৬ ত্রিপুরাব্দের ২৭শে অগ্রহায়ণ, কলিকাতা নগরীতে গঙ্গাতীরে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। কেওড়াতলায়, মহিশূরের মহারাজের সমাধি সন্নিকটে মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে।